শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল-প্রণীত

সঙ্গিনী

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
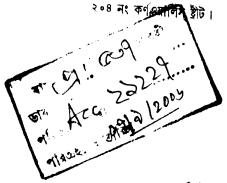
প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

বিউটী প্রেস্

২৪২।১ নং অপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

যাঁহার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ

লৌহ-বর্ম্মের মত

আমাকে সমস্ত বিপদ হইতে

সতত রক্ষা করিতেছে

সেই মায়ের চরণে

আমার এ

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৪

কৃতজ্ঞতা

এই পুস্তক লিখিতে আমি অনেক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল বিখ্যাত ও প্রবীণ গ্রন্থকারের পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত আমি কোন দিনই এই পুস্তক লিখিতে পারিতাম না, তাঁহাদের নিকট আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকার।

উপহার

সূচী

আদর্শ সঙ্গিনী

সঙ্গিনী

দশ-মহাবিদ্যা-রূপ

বালিকা ভূমিষ্ঠ হইবার পর সে কেবল মায়ের আদরে, পিতার স্নেহে দিন দিন শশি-কলার মত নারীর কোমলতা লইয়া ধীরে ধীরে এই ধরণীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়ে; তখন তাহার সরল মুখের সুন্দর হাসিটুকু এতই সুন্দর বলিয়া মনে হয় যেন স্বর্গের সমস্ত সুষমা, বালিকার সেই হাসিটুকুর ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। তখন কে ভাবিতে পারে যে দুই দিন পরে এই বালিকাই কিশোরী হইবে,—ইহাকে সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে,—সংসারের শত-সহস্র গুরু দায়িত্ব আপনা হইতেই ইহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে। প্রেমের প্রদীপ মাথায় লইয়া,—আশার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া কঠোর পুরুষকে কোমলতার আবরণ পরাইয়া দিবে। পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হইয়া, শোক তাপ পরিপূর্ণ জ্বালাময় সংসারকে শান্তি-নিকেতন করিবে। তাই নারীর আর একটী নাম সঙ্গিনী।

পুরুষ যাহাকে সঙ্গিনী করিয়া প্রথম সংসার-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,—তাহার দায়িত্ব যে কত বড় তাহা কেবল প্রকৃত সঙ্গিনীই বুঝিতে পারে। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পুরুষ যখন নিরাশার অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতে থাকে তখন কেবল সঙ্গিনীর কোমল স্পর্শে, আশার কথায়—সে আবার নব উদ্যমে সংসার-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

প্রকৃত সঙ্গিনী সংসার-নিকেতনে স্বর্ণ-শতদলের উপর উপবিষ্টা হইয়া দশ-মহাবিদ্যা-রূপে সমস্ত সংসারটি ধারণ করিয়া থাকে। সঙ্গিনীর এই দশ-মহাবিদ্যা-রূপ যিনি দেখিয়াছেন তিনি ধন্য,—পৃথিবীতে তিনিই প্রকৃত সুখী। যে সংসারে সঙ্গিনীর এই দশ-মহাবিদ্যা-রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে সে সংসারে চঞ্চলা লক্ষ্মী চিরদিন অচঞ্চলা হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সেখানে দুঃখ দৈন্য থাকিতে পারে না,—তথায় শান্তি আপন রাজ্য পাতিয়া বসে।

হিন্দুর জীবন এক মহা যোগে সমাহিত,—হিন্দুর বিবাহ এক মহা যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনই যোগ। অরণ্যে, নিভৃত গিরিগুহায় যোগী হৃদয় মধ্যে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন স্থাপিত করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। সংসারে,—গৃহে পুরুষ স্ত্রীর সহিত এক হইয়া,—প্রকৃত সঙ্গিনী লাভ করিয়া প্রকৃতির সম্মিলন স্থলে পরমব্রহ্মে বিলীন হয়েন। তাই সঙ্গিনীর এত প্রয়োজন,—তাই হিন্দু-বিবাহ এত আধ্যাত্মিক।

যে গৃহে সঙ্গিনীর অভাব, যে সংসারে সঙ্গিনী তাহার কর্ত্তব্য-

কর্ম্মে অবহেলা করে—সে গৃহ শ্মশান। তথায় সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দতা;—ঐশ্বর্য্য বীর্য্য কান্তি;—ধর্ম্ম মহানুভবতা সহানুভূতি কিছুই স্থান পায় না। শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, কলহ, অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতায় সে সংসার দিবানিশি হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকে। সংসারে সুখ শান্তি, ধন মান, বল বীর্য্য, অলৌকিক শক্তি উপভোগ করিতে হইলে,—পরলোকে স্বর্গে ও জীবনের শেষে অনন্ত মুক্তির একমাত্র উপায় প্রকৃত সঙ্গিনী লাভ। যিনি যোগেশ্বরী শ্রীরূপে স্বামীর ভিটায় সতীর-স্বর্গে অধিষ্ঠিতা হইয়া সমস্ত সংসারে সুখ শান্তি ছড়াইয়া থাকেন। সেইরূপ প্রকৃত সঙ্গিনী লাভ ব্যতীত সংসার সুখের হইতে পারে না—জীবন শান্তিময় হয় না।

মহাযোগে জগৎ পরিচালিত। জগতে একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুতে মিলিত হইতে ব্যগ্র,—একটী প্রাণ আর একটী প্রাণে সম্মিলিত হইবার জন্ম ব্যাকুল। অনন্ত আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী, নিবিড় অরণ্যের শ্বাপদ, প্রমোদ-কাননের শ্যামল বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গম, এই সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলে এক মহাযোগে সম্মিলিত হইতে ব্যাকুলিত। সিংহ সিংহী সহ, কোকিল কোকিলবধূ সহ, কীটাণু কীটাণু, পুষ্পরেণু পুষ্পরেণু সহ মিলিবার জন্ম আকুলিত। পুরুষ সঙ্গিনী লাভের জন্ম তাই এত ব্যাকুল। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গিনী লাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, শিক্ষার বৈগুণ্যে হিন্দু অন্তঃপুরের চির পবিত্র সঙ্গিনীর আসন টলটলায়মান;—দিন দিন ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু-ললনায় আর

সে শিক্ষা নাই, সে দীক্ষা নাই, এক্ষণে আর তাহারা জননীর আদর্শে গঠিত হইয়া উঠে না। স্কুলে পড়িয়া নাম মাত্র কয়েকখানা পুস্তক উলটাইয়া অতি শৈশব হইতেই কেবল জ্যাঠামো শিখিয়া এক মহা বিকৃত আদর্শে গঠিত হইয়া উঠে;—যাহা হিন্দু অন্তঃপুরে একবারেই খাপ খাইতে পারে না,—যাহা সঙ্গিনী হইবার পক্ষে একবারেই অন্তরায়,—আবর্জ্জনার স্বরূপ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ ব্যতীত প্রকৃত সঙ্গিনী হওয়া যায় না;—প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে নিজেকে সংযত রাখাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। চিন্ময়ী প্রকৃতি সঙ্গিনীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া সংসারে আসিয়া সংসার-মহাযোগ সাধনে সদা যাহাকে পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে, তিনি যদি তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে কেমন করিয়া সেখানে শান্তি থাকিতে পারে? সঙ্গিনীর মহা পবিত্র সেই দশ-মহাবিদ্যা-রূপের একবারেই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সে রূপ যে কত সুন্দর, কত পবিত্র, হিন্দুর কত গর্ব্বের, যিনি দেখিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন:— *

"মনে হয় আমি কি? কি জন্য হইলাম! গাছে পাতা যেমন হয়, তেমনই হইয়াছি মাত্র! আমার ঐ আমি পদার্থটী কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির সমষ্টি বই আর কিছুই নয়। এমন আমার থাকাই বা কি—আর না থাকাই বা কি?

মন যেন কি চায়, অথচ পায় না। কি চায় তাহা জানে না।

* পারিবারিক প্রবন্ধ

যাহারা শৈশবে আমায় কোলে পিঠে করিত, নিজের বলিয়া আদর করিত, তাঁহারা এক্ষণে অনেকেই নাই, যাহারা আছেন তাঁহারাও দুই দিন পরে থাকিবেন না—পৃথিবী শ্মশান ভূমি, এখানে আসিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া ফল কি? কে এক দেবী মূর্ত্তি আসিয়া আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইলেন,—আমার হাতে হাত দিয়া বলিলেন, "আমিই তোমার!"

তবে আমার বলিয়া কেহ আছে, তবে আমি শূন্য নহি, আমি একজন। আমি থাকিব, আমি বাড়িব, আমি করিব, তবে জগৎ শূন্য নহে। যিনি সঙ্গিনীরূপে সংসারে আসিয়া আমার হৃদয়ের শূন্যতা বিদূরিত করিলেন,—যিনি চিরদিনের মত আমার সঙ্গিনী হইলেন,—তিনিই আমার হৃদয়ের **স্থিতি-বিধায়িনী!**

অন্তর্দৃষ্টি অতীত কালের প্রতি ধাবিত হইয়া আর পৃথিবীকে শ্মশান-ভূমি দেখাইল না। বর্ত্তমান কাল এই মহা-দেবীর হাস্য-প্রভায় রঞ্জিত হইয়া আশার আলোকে চিত্রিত ভবিষ্যৎ কালের সহিত একীভূত হইল। ধরাতলে একটী আরাম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলাম। ঐ আশ্রমেই এই গৃহদেবীর লীলাস্থল, তিনিই আমার **আশ্রম-বিধায়িনী!**

এই আরাম কাননে ক্রীড়া রস অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সমুদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রমোদ উদ্যানে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আদ্যাশক্তি স্ত্রী-শক্তিতে উপলব্ধ হইল, জড় জগতে চিন্ময়তা দেখিলাম, যিনি এ মহাদৃশ্য দেখাইলেন তিনিই আমার **লীলাময়ী!**

মুখে হাসি আর ধরে না, প্রতি পাদ-বিক্ষেপে প্রসূনরাশি প্রস্ফুটিত হয়,—প্রতি দৃষ্টিপাতে হিমাংশু কিরণ বর্ষিত হয়,—চারিদিকে আনন্দের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতেছে,—চারিদিকে সুখের বাতাস বহিতেছে,—যাঁহার কৃপায় গৃহ এই আনন্দ কানন হইয়াছে, তিনিই আমার **আনন্দময়ী** !

কিছুরই অভাব নাই, কিছুরই অস্থিরতা নাই, সকলটিই যথাযথ, সকলটিই শোভনীয়, সকলটিই পূর্ণ,—নাই বলিয়া কিছুই নাই। যাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহাই উথলিয়া উঠে, যাহাতে হস্ত প্রদান করেন তাহাই শোভাময় হয়, যে নিকটে আইসে সেই আনন্দে বিভোর হইয়া যায়—ইনিই আমার **গৃহলক্ষ্মী** !

দেখিতে দেখিতে এক একটী করিয়া কয়েকটী শিশুমূর্ত্তি এই আনন্দ নিকেতনে দেখা দিল, উহাদের দেহে তাঁহার ও আমার উভয়ের অবয়ব সম্মিলিত দেখিলাম। হৃদয় মমতায়, মায়ায়, স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের নিতান্ত নিজস্ব আপনার জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যাহা হইতে এই অমূল্যরত্নগুলি পাইলাম তিনিই আমার **বর-প্রদায়িনী** !

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরগুলিকে পাইয়া কি আনন্দ, কি উৎসাহ! জড়-জগতকে স্পষ্ট চক্ষে চিন্ময় জগৎ দেখিলাম। নিজের শক্তিকে অপরিমেয় বুঝিলাম।

চিত্ত-গিরি যেন উন্নত হইতে হইতে আকাশ স্পর্শ করিতে চলিল। শ্রমশীলতা, কার্য্য-তৎপরতা, পরিণাম-দর্শিতা সেই গিরির শিখর-

দেশে দৃঢ় হইয়া বসিল, আমি মানুষ হইলাম, যাঁহার কৃপায় এই শক্তিশালী হইলাম তিনিই আমার **সামর্থ্য-বিধায়িনী !**

এ কি হইল সেই সর্ব্বপ্রথমটি কই, সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটি কই। সেটা কোথায় চলিয়া গেল ? যেখানে গিয়াছে আমিও সেইখানে যাইব। আর ত এ বিষম তাপ সহ্য হয় না। ছুটিয়া বাহির হইতেছিলাম—হাত ধরিলেন। সম্মুখস্থ বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। বৃক্ষতলে বহুসংখ্যক অপক্ক কুঁড়ি ঝরিয়া পড়িয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ কণ্ঠে কাতরে বলিলেন, "মুকুল যত হয় নাথ, ফল তত হয় না।" তথ্য বুঝিলাম, গৃহে ফিরিলাম। যাহার নিকট হইতে এই তথ্য বুঝিলাম তিনিই আমার **প্রবোধ-দায়িনী !**

এ কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইল ! তিনি কই ! যাহাদিগকে নিতান্ত আমার বলিয়া জ্ঞান করিতাম, তাহাদিগকে আর তো আমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। সকলেই যেন আমা হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছেন। আমি আবার জগতে একা। আবার আমার পৃথিবী শ্মশান। যেমন হৃদয় মধ্যে এইরূপ ভাবিলাম অমনি কর্ণে মধুর বাণী প্রবেশ করিল, "শোকে বিহ্বল হইও না—তুমি আর একা হইতে পার না। পৃথিবী আর তোমার নিকট কিছুতেই শ্মশান হইতে পারে না। তোমার হৃদয় যে আর শূন্য নাই। তুমি যে পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া জানিয়াছ। যাঁহার কণ্ঠ হইতে এই মধুর বাণী নিঃসৃত হইল তিনিই আমার **হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী !**

পৃথিবী এখন আমার কর্ম্মক্ষেত্র? আমি কি জন্য, কাহার জন্যই বা কাজ করিব? আমার বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার আর সে সাহস নাই। অমনি হৃদয়-বাণী শুনিলাম, "পৃথিবী শ্মশানও নয় আবাসস্থলও নয়; ইহা যে কর্ম্মক্ষেত্র। তাহা তুমি শিখিয়াছ, তোমার সাহস নাই তো সাহস আছে কার? যদি সাহস নাই তো মরিতে ভয় কর না কেন?" যাঁহার কৃপায় এই তথ্য বুঝিলাম তিনিই আমার **যম-ভয়বারিণী**।"

যিনি এই দশ-মহাবিদ্যা-রূপের অধিকারিণী তিনিই প্রকৃত সঙ্গিনী। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক বঙ্গবালাই এই দশ-মহাবিদ্যা-রূপের অধিকারিণী হইয়া স্বামীর গৃহ আলোকিত করিতেন, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা নাই;—হিন্দু অন্তঃপুরের সঙ্গিনীর এই দশ-মহা-বিদ্যা-রূপ বিকৃত শিক্ষার ধূমে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন যেরূপ অধোগতির দিকে চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সময়ে ইহা একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। এখন সাবধান না হইলে সুদূর ভবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকারময় তাহাতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে কি কি গুণের প্রয়োজন, কি কি গুণ নারীর দেহে থাকিলে সে প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে পারে তাহাই এই পুস্তকে একে একে বিবৃত হইবে।

শৈশব—শিক্ষা

ভবিষ্যতে যাহাকে পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া গৃহ-রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হইতে হইবে, তাহার শিক্ষার অন্ত নাই। অতি বাল্যকাল হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। শিক্ষা অর্থে লেখাপড়া নহে। পৃথিবীতে প্রত্যেক বিষয়ই শিখিতে হয়,—শিক্ষা ব্যতীত মানুষ কোন বিষয়েই উন্নত হইতে পারে না। সঙ্গিনীর লেখাপড়া শিখিবার যে একেবারে প্রয়োজন নাই এমন কথা আমরা একবারও বলিতে পারি না। তবে লেখাপড়া শিখিবার অপেক্ষা রন্ধন-শিক্ষা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, সীবন-শিক্ষা তাহাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি সংসারের কোন কার্য্যই করিতে শিখিলাম না, কেবল রাশি রাশি বড় বড় পুস্তক পড়িয়া বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তাহা হইলেই সঙ্গিনীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না। তিনি ভাষায় পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু সংসারে কোন দিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না। সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য,—সঙ্গিনীর ধর্ম্ম,—সঙ্গিনীর আচরণ যে নারীর শিক্ষা হয় নাই আমরা তাহাকে সঙ্গিনী নামের যোগ্য বলিয়াই মনে করি না। সঙ্গিনীর ভূষণ হইবে লজ্জা, বিনয়, সরলতা ও স্নেহ মমতা,—তাহার হস্ত দুইটি সংসারের প্রতি কার্য্যে সতত সুনিপুণ হইবে,—মুখখানিতে সুহাস্য সদাই উচ্ছলিয়া থাকিবে। সংসারের প্রতি কার্য্যে শত উৎসাহ,—বিরক্তি

বলিয়া একটা জিনিষ তাহাকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারিবে না—তবেই সে সঙ্গিনী নামের যথার্থ যোগ্য,—তবেই সে প্রকৃত সঙ্গিনী।

তাই বলি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গিনীর শিক্ষা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। অতি বাল্যকালই প্রত্যেক বালিকার প্রথম জননীর নিকট হইতে পান সাজা, বিছানা পাতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গুলি শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া লেখা-পড়া শেখা উচিত। পরীক্ষায় পাশ করিবে বলিয়া বালিকার পড়া নয়, তাহার পাঠ শিখিবার জন্য কাজেই তাহাকে হুড়ুম দুড়ুম করিয়া পুস্তকের পর পুস্তক শেষ করিবার আবশ্যক নাই, যে পুস্তকখানি পড়িবে তাহাই তাহার রীতিমত শিখিবার মত করিয়া পড়া উচিত। ভাল ভাল দুই চারিখানি বই যদি তাহার পড়িবার মত করিয়া পড়া হয় তাহা হইলেই তাহার লেখা পড়া শিখিবার যেটুকু প্রয়োজন তাহাতেই তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে। পাঠের অপেক্ষা বালিকার লেখার প্রতি মন দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সাংসারিক কার্য্যে হিসাব নিকাশ সঙ্গিনীরই রাখা উচিত। হাতের অক্ষরগুলি সুন্দর হইলে জমা খরচ পরিষ্কার থাকে,—লেখা পড়িতে কাহার আর কষ্ট পাইতে হয় না। সঙ্গিনীর হস্তাক্ষর কদর্য্য হইলে নানা বিপত্তির সম্ভাবনা।' যদি কখন তাহাকে কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র যাইতে হয় তাহা হইলে সকল দিকেই বিপদ। ধোপা কাপড় লইয়া আসিয়াছে কিন্তু ঠিক মিলাইয়া লইবার উপায় নাই কেন না যিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার হস্তাক্ষর অস্পষ্ট। তাই

বলি প্রত্যেক নারীর হস্তাক্ষরগুলি যাহাতে সুন্দর হয় বাল্যকাল হইতেই তাহার চেষ্টা করা উচিত। শৈশব হইতে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে, একটু ধরিয়া ধরিয়া যত্ন করিয়া লিখিলে অতি সহজেই হস্তাক্ষর সুন্দর হইতে পারে। ইহা ব্যতীত জননীর হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে তাহার কন্যার হস্তাক্ষরও যে সুন্দর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে যাহাকে জননী হইতে হইবে,—যাঁহার আদর্শে ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততি গঠিত হইবে,—তাঁহার শিক্ষা যে কত কঠিন প্রত্যেক নারীরই কি তাহা একবার চিন্তা করা উচিত নয়?

বালিকাদিগের হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া যদ্রূপ প্রয়োজন, বর্ণাশুদ্ধি বিষয়েও প্রথম হইতেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রায় দেখা যায় বালিকাদিগের লিখিবার সময় রাশি রাশি বর্ণাশুদ্ধি হইয়া থাকে ও মাঝে মাঝে অক্ষর পড়িয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; শৈশবে অসাবধানতার দোষে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য প্রথম লিখন শিখিবার সময় হইতেই প্রত্যেক বালিকারই এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত।

লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগের বাল্যকাল হইতেই বাজারের হিসাব, ধোপার হিসাব রাখিতে জননীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করা উচিত। জননীর নিকট প্রশ্ন করিয়া করিয়া এই সকল মুখে মুখে শিক্ষা করিলে অতি সহজেই বালিকারা এই সকল বিষয়ে পরিপক্ক হইয়া উঠিতে পারে। জননী কিরূপ ভাবে ভাঁড়ার ঘরে জিনিষ পত্র রাখেন, কয়জন আহার করিলে কত

পরিমাণ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। জননীর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া জননীকে সাংসারিক সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া এ সকলও তাহাদের শিখিয়া রাখা উচিত। বাল্যে এই সকল বিষয় শিখিয়া রাখিলে কৈশোরে তাহাদের আর পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয় না। দায়িত্বপূর্ণ সঙ্গিনীর আসন গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষার পক্ষে তাহাদের আর কোনরূপ দ্বিধা বোধ হয় না।

প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে বাল্যে কি কি শিক্ষা করা প্রয়োজন তাহাই বলিলাম। এইবার সঙ্গিনী কি,—সঙ্গিনীর সহিত স্বামীর কি কি সম্বন্ধ তাহাই বলিব।

সঙ্গিনী

--০◊০--

শৈশবে পিত্রালয়ে রমণী-জীবনের কিছুরই বিকাশ হয় না। কেন না সেখানে তাহার কোনই দায়িত্ব নাই,—সেখানে তাহার কেবল স্নেহ ও আদরের সম্বন্ধ। নারী যে দিন সঙ্গিনী-রূপে পিত্রালয় ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয় সেই দিন হইতেই তাহার নব-জীবন আরম্ভ হয়,—নারী-জীবনের সমস্ত মাধুরী একে একে বিকাশ পাইতে থাকে। পর-রাজ্যে যেমন রাজার বিশেষ কোন কর্ত্তব্য থাকে না—সঙ্গিনীরও সেইরূপ পিত্রালয়ে বিশেষ কোন কর্ত্তব্য নাই—কিন্তু নিজ রাজ্যে রাজার কর্ত্তব্য অসীম, দায়িত্ব গুরুতর। সেইরূপ শ্বশুরালয়ে—স্বামীর ভিটায়,—নিজের সংসারে সঙ্গিনীর দায়িত্ব গুরুতর, কর্ত্তব্য অসীম। এত দায়িত্ব, এত কর্ত্তব্য-পূর্ণ সঙ্গিনী জীবন কি,—প্রকৃত সঙ্গিনী কাহাকে বলে তাহা প্রত্যেক রমণীরই জানিয়া রাখা উচিত। তুমি সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছ—কিন্তু প্রকৃত সঙ্গিনী কি—তাহা না জানিলে তুমি কেমন করিয়া প্রকৃত সঙ্গিনী হইবে?

প্রকৃত সঙ্গিনী কে? যাহার হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত একেবারে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে,—যে সংসারে সর্ব্বদাই স্বামীর জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। যে স্বামীর সহিত তাহার প্রকৃত

সম্বন্ধ কি ও সম্বন্ধ বশতঃ কর্ত্তব্য সকল উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম। যাহার মাধুরীতে চাঁদের বিমল আলোর মত স্বামীর সংসারটি দিনরাত আলোকিত হইয়া থাকে। সেই প্রকৃত সঙ্গিনী,—সেই যথার্থ সঙ্গিনী নামের যোগ্য।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ সেরূপ সম্বন্ধ এ সংসারে আর কাহার সহিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বিবাহ সকলেই করিয়া থাকেন, সকলেই করিতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহের দায়িত্ব ও বিবাহে স্বামী ও সঙ্গিনীর মধ্যে কি কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা কয়জন বুঝিতে পারেন?

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রধানতঃ চারিটী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রথম অংশী সম্বন্ধ,—দ্বিতীয় সখা সম্বন্ধ,—তৃতীয় স্ত্রী সম্বন্ধ,—চতুর্থ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। যে রমণী এই চারিটী সম্বন্ধের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া সংসারে তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারে,—সেই প্রকৃত সঙ্গিনী;—সংসার-নিকেতনে সঙ্গিনীর; চির পবিত্র, চির গৌরবের সিংহাসন পাইবার সেই একমাত্র যোগ্য। সে যে কেবল নিজে সুখী হয় ও নিজের স্বামিটিকে সুখী করিতে পারে তাহা নহে;—তাহার চারি পার্শ্বস্থিত সকলেই এক অপরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ স্রোতে ভাসিতে থাকে।

যে স্বামীর সহিত নিজ সম্বন্ধ সকল বুঝিতে পারিয়াছে—যে সেই সকল সম্বন্ধানুযায়ী কর্ত্তব্য সকল বুঝিয়া কার্য্য করিতে

শিখিয়াছে; যে সেই সকল কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করে না;—যে স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে; যে নিজ সুখ দুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে,—যে আপনার অস্তিত্বটুকু একেবারে ভুলিয়া স্বামীর সহিত নিজেকে এক করিতে পারিয়াছে, যে স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, যে স্বামী ভিন্ন নিজের কিছু আছে ইহা একেবারেই মনে করিতে পারে না, এমন কি মনে করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। স্বামী যাহার পূজার দ্রব্য,—ব্যবহারের সামগ্রী—ক্রীড়ার বস্তু। স্বামী যাঁহার বন্ধু স্বজন আত্মীয় সব। স্বামী যাঁহার হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের ভগবান সেই প্রকৃত সঙ্গিনী,—প্রকৃত বিবাহ তথায়।

যে নিজ সুখের সম্পূর্ণ ভার স্বামীর উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছে, যে স্বামীর সুখের সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে পারে, যে স্বামীর সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ দায়ী আপনাকে বিবেচনা করিয়া থাকে সেই প্রকৃত সঙ্গিনী। যে রমণী সঙ্গিনীর সমস্ত ভার, সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সেই প্রকৃত সঙ্গিনী।

স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারি সম্বন্ধ। এই চারি সম্বন্ধ ভিন্ন জগতে আর কোন প্রকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সেই জন্যই মানুষের সহিত মানুষের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সে সমস্ত সম্বন্ধই বিদ্যমান আছে। বিবাহের মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর সেই সমস্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর প্রথম সম্বন্ধ অংশী, যে একজনের কার্য্যের অংশ লইয়া উভয়ের স্বার্থের জন্য কার্য্য করিয়া থাকে সেই অংশী। পুরুষের কাজ অসংখ্য। সমস্ত কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কথনই সম্ভব নহে। সেই জন্যই সংসারে সেই সকল কাজ তাহার হইয়া সম্পন্ন করে, তাহার স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ এক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে এরূপ একজন লোকের আবশ্যক হইয়া থাকে। এরূপ লোক একজন না পাইলে সংসার সুশৃঙ্খলার সহিত কিছুতেই চলিতে পারে না ; যেমন ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলে, কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইবার জন্য দুই চারি জন অংশীর প্রয়োজন হয় সেইরূপ সংসারে, জীবন-বাণিজ্যে একজন কর্ম্মক্ষম অংশী পাইলে সমস্ত কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর প্রথম সম্বন্ধের নাম তাই অংশী সম্বন্ধ।

স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ সখা। সংসারিক কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সিদ্ধির জন্য সঙ্গিনীর সহিত স্বামীর প্রথম সম্বন্ধ কিন্তু তাহাতে তো মনের অভাব পূর্ণ হয় না। মন যে ভালবাসিতে চায়,—মন যে মনের মানুষ পাইবার জন্য ব্যাকুল। মন যে আর একটী মনের গলা জড়াইয়া তাহাকে নিজ সুখ দুঃখের ভাগী না করিলে সন্তোষ হয় না। মনের এ অভাব পূর্ণ হয় কিসে? তাই জগতে একজন সখার বিশেষ প্রয়োজন। পৃথিবীতে যাহার বন্ধু নাই তাহার প্রাণ দিন রাত্রই শূন্য হইয়া থাকে। যাহার সহিত

পার্থিব সমস্ত কার্য্য সম্মিলিত,—যাহার নিকট শারীরিক ও মানসিক কোন বিষয়ই গোপন নাই,—বন্ধু হইবার মত তাহার ন্যায় উপযুক্ত পাত্র কে? যাহার স্বার্থের সহিত নিজ স্বার্থ জড়িত সেই প্রকৃত বন্ধু। ইহাই স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ যদি স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর না হইল,—যদি স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর কোন বিষয় গোপন রহিল,—যদি স্বামী সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া প্রাণ মন খুলিয়া নিজ সুখ দুঃখ তাহার কর্ণে ঢালিয়া না দিল,—যদি সঙ্গিনী ছুটিয়া আসিয়া নিজ সুখ দুঃখের ভাগী স্বামীকে না করিল তবে সে কিরূপ সঙ্গিনী? প্রথম সম্বন্ধ আপনা আপনি কার্য্য গতিকে হইয়া পড়ে,—না হইলে চলে না বলিয়াই হয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব আপনা আপনি হয় না। বন্ধুত্ব চেষ্টা করিয়া উভয়ের মধ্যে করিতে হয়। সুখই হউক আর দুঃখই হউক অন্যকে তাহার ভাগী করিতে না পারিলে সে সুখ ও দুঃখের ভোগ হয় না। যদি পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী হইতে চাও তবে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, আর সেই বন্ধুত্ব স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে না হইলে বন্ধুত্বের অর্দ্ধেক মাধুরীই অপরিস্ফুট রহিয়া যায়। তাই এই সম্বন্ধ স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর অতি আবশ্যকীয়।

এই দুই সম্বন্ধই স্বামীর সহিত স্ত্রীর শেষ নয়। স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর তৃতীয় সম্বন্ধ স্ত্রী-সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়া সৃষ্টি রক্ষা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবানেরও তাহাই ইচ্ছা। সেই জন্যই স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর তৃতীয় সম্বন্ধ স্ত্রী। সংসার-কুঞ্জে

যাহা হইতে পুত্র কন্যা সোনার ফুলের মত ফুটিয়া উঠে,—স্নেহের স্রোত ধরার অঙ্গে যুগযুগান্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধটাও বড় কম গুরুতর নহে। সেই জন্যই সঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সন্তান পালন।

এই তিন সম্বন্ধ ব্যতীত স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর আর একটি সম্বন্ধ আছে তাহার নাম আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধটি কেবল এই পৃথিবীর নহে—অনন্ত কালের। তুমি তোমার স্বামীর কেবল এই পৃথিবীর সঙ্গিনী নও, মৃত্যুর পরও তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বিধ্বস্ত হইবে না। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত,—যতদিন না তোমার অস্তিত্ব লোপ হয়—ততদিন তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গিনী থাকিবে। সেইজন্যই স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর শেষ সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। কেবল অন্ন ও কল্যাকার জন্য নহে,—কেবল এই পৃথিবী ও এই জীবনের জন্য নহে,—সঙ্গিনী অনন্ত কালের জন্য। এক্ষণে কোন সম্বন্ধ সম্বন্ধে সঙ্গিনীর কি কি কর্ত্তব্য তাহাই আমরা একে একে বলিব।

অংশী সম্বন্ধ। সঙ্গিনী অংশী রূপে স্বামীর সমস্ত পার্থিব কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে। ধন, মান, যশ, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি উপার্জ্জন করা স্বামীর কার্য্য, স্বামীর সেই সমুদয় কার্য্যের পথে সর্ব্বদা শান্তি ও সুখরূপ সুন্দর পুষ্প ছড়াইয়া ছড়াইতে যাওয়াই সঙ্গিনীর কার্য্য। স্বামী মস্তকের স্বেদজল পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, স্বামীকে সেই পরিশ্রমের মধ্যে শান্তি ও সুখ দান করাই সঙ্গিনীর কার্য্য। পরিশ্রমে যাহাতে তিনি না ক্লিষ্ট হন,

আশাতে যাহাতে তিনি না নিরাশ হইয়া পড়েন, সঙ্গিনীর কার্য্য তাহাই করা। কৃষক নিদাঘের দারুণ সূর্য্য উত্তাপে ভূমি কর্ষণ করিতেছে ও নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করিলে নিকটস্থ সুশীতল বটবৃক্ষ তলে আসিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছে। প্রখর তপন তাপেও সে ক্লান্ত হইতেছে না, জানিতেছে যে নিকটেই সুশীতল বৃক্ষছায়া আছে ;—একটু শ্রান্তি বোধ করিলেই তথায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। এই কৃষকের নিকট সেই বটবৃক্ষ যেরূপ, সংসারে মানবের নিকট সঙ্গিনীও সেইরূপ। বটবৃক্ষ যেরূপ কৃষকের কার্য্যের একরূপ অংশ গ্রহণ করিয়া কৃষককে সোৎসাহ রাখিতেছে, সঙ্গিনীও ঠিক সেইরূপ স্বামীর সংসারিক কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়া স্বামীকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত রাখিবে। স্বামীকে কখনই কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতে দিবে না। স্বামী পরিশ্রম করিতেছেন, সঙ্গিনী সর্ব্বদাই স্বামীর পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় রহিবে। যখনই দেখিবে স্বামী একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছেন অমনি সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার সহাস্য মুখের মধুর কথায় তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর করিয়া দিবে।

সখা-সম্বন্ধ। স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর দ্বিতীয় সম্বন্ধ সখা সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের জন্য স্বামীর প্রতি সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য কি তাহাই এক্ষণে বলিব। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য যাহা এই সম্বন্ধের জন্য স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য তাহাই। বিপদাপদে, সুখ দুঃখে স্বামীকে প্রাণ দিয়া ঘিরিয়া রাখিবে। প্রাণের কথা সরল মনে খুলিয়া বলিবে। কোন বিষয়ই গোপন করিবে না। স্বামী

স্ত্রীতে প্রকৃত বন্ধুত্ব না হইলে সংসার কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। যেখানে স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর বন্ধুত্ব নাই সেখানে স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর দাসী সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সেই জন্য যে উপায়েই হউক স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর সখা সম্বন্ধ সুদৃঢ় করা উচিত।

স্ত্রী-সম্বন্ধ। স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর তৃতীয় সম্বন্ধের নাম স্ত্রী-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রথম ভালবাসার বৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় স্বামীকে মুগ্ধ করা,—তৃতীয় সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সন্তোষোৎপাদন করা। যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় নাই, যে সঙ্গিনী স্বামীর বিরহে দশদিক অন্ধকার না দেখে, তাহাদের ভিতর এই সম্বন্ধ না থাকাই উচিত। সেই জন্যই বলিতেছি সর্ব্বাগ্রে ভালবাসার বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে ভালবাসাতে স্বামী ও স্ত্রীর এই সম্বন্ধ ঘনীভূত করে তাহার রূপে বা গুণে পরস্পরে মুগ্ধ হওয়া চাই। সেই জন্যই বলি যেমন করিয়া পার স্বামীকে মুগ্ধ কর। সৌন্দর্য্য ভিন্ন অপরকে মুগ্ধ করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু একই সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয় না। আমি যাহাকে পরমাসুন্দরী মনে করি অপরে হয় তো তাহাকে কুৎসিত বিবেচনা করে। কাজেই কেবল রূপের সৌন্দর্য্য মানুষকে কখনই মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যদি আমি জানিতে পারি কি সৌন্দর্য্যে বা কি গুণে সে মুগ্ধ হয়, তাহা হইলে আমার তাহাকে মুগ্ধ করিতে কতক্ষণ বিলম্ব হয়! এই জন্যই সঙ্গিনীকে সর্ব্বপ্রথম স্বামীর প্রাণের সহিত নিজের

প্রাণটুকু মিশাইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা উচিত। হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিলে স্বামী কিসে মুগ্ধ হন তাহা অবগত হওয়া সঙ্গিনীর পক্ষে সুকঠিন নহে। স্বামি কিসে মুগ্ধ হন তাহা জানিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করিলে স্বামী না মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই থাকিতে পারেন না। স্বামী যদি একবার মুগ্ধ হন তাহা হইলে ভালবাসা ঘনীভূত হইতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু এ প্রেম, এ ভালবাসা, যেমন দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনি দেখিতে দেখিতে লোপও পাইতে পারে। মুগ্ধতার উপর যে ভালবাসার ভিত্তি সে ভালবাসা, লোপ হইতে কতক্ষণ, মুগ্ধতার পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আজ যে বিষয়ে একজন মুগ্ধ হইল, কাল হয় তো আর সে সে বিষয়ে মুগ্ধ হইবে না। সঙ্গিনী যদি কেবল এই ভালবাসার বৃদ্ধি সাধন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে তাহা হইলে সে দেখিবে যে সময়ে স্বামীর ভালবাসা কমিয়া আসিতেছে। ক্রমে এমন সময়ও উপস্থিত হইতে পারে যখন সে একেবারেই স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সেই জন্যই বলি শুধু ভালবাসার বৃদ্ধি সাধন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। লোকে যেরূপ পাখী পোষে সঙ্গিনীকে সেইরূপ ভাল-বাসাকে চিরদিন হৃদয়ে রাখিয়া যত্নে লালনপালন করিতে হইবে। চিরদিন স্বামীর হৃদয়ের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইবে, দেখিতে হইবে তাহার রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না—যদি হয়—তখনি অমনি সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এ জীবন অনন্তকাল স্থায়ী, সেই অনন্ত কালের সঙ্গিনী হইলে কি করা কর্ত্তব্য এবং তাহা কত বড় গুরুতর তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। অনন্তকালের জন্য একটী হৃদয় আর একটী হৃদয়ের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারে এমন দ্রব্য এ পৃথিবীতে কি আছে? কি পাইলে কি করিলে দুইটী হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয় না? মৃত্যুর পরও যে শৃঙ্খল ছিন্ন হয় না,—উভয়ে উভয়কে ভুলিতে পারে না, জগতে এরূপ দৃঢ় শৃঙ্খল কি? মৃত্যুর পর এ দেহ থাকে না, এ পার্থিব সৌন্দর্য্য থাকে না, হৃদয় ভিন্ন মানবের সকলই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। এই হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে চিরদিনের জন্য বাঁধিতে হইবে এমনি একটী সুদৃঢ় শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহা মৃত্যুর ন্যায়বিপর্য্যয়েও ছিন্ন হইবে না। এ সংসারে ভালবাসার নামই শ্রদ্ধা; এ বিশ্বে ভালবাসার নামই উপাসনা। উপাসনা করিলে, প্রার্থনা করিলে ভগবান আমাদের সেই প্রার্থনা শুনিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি না তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। তবে আমরা এইটুকু দেখিতে পাই প্রার্থনা করিলে অন্তরে শান্তির উদয় হয়; হৃদয়ে কোথা হইতে নব বল আইসে, মনে এক অসীম উৎসাহ দেখা দেয়। তাহার কারণ মন ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া, প্রাণের সঙ্গী বলিয়া মন খুলিয়া বল ভরসা সকলেই বিধাতার নিকটে প্রার্থনা করে তাই এ সন্তোষ, এ বল প্রাপ্ত হয়। করুণাময় সর্ব্বজানিন জগদীশ্বর কি জানিতেন না যে তাঁহাকে লোকে দেখিতে পাইবে না; তাঁহাকে

লোকে বুঝিতে পারিবে না অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই লোকের পূজার প্রয়োজন ও উপাসনার আবশ্যক হইবে। তাই তিনি মানব যাহাকে সহজে ভালবাসিতে পারিবে তাহাকেই প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছেন। স্বামী ও স্ত্রীর সহিত সেই ভালবাসা হওয়ার প্রয়োজন। যে ভালবাসা,—ভালবাসার জন্য ভালবাসা—যে ভালবাসার কারণ নাই, যে ভালবাসা না বাসিয়া থাকা যায় না। এ ভালবাসায় রূপ চাহে না,—গুণ চাহে না, এ ভালবাসা কিছুই চায় না। ভাল না বাসিলে প্রাণের ভিতরকার ভালবাসার স্রোত না খুলিয়া দিলে, প্রাণ যেন শূন্য শূন্য রহে। এ ভালবাসা এ পূজার জন্য,—অনন্তকালের অনন্ত সঙ্গিনীর জন্য ভালবাসা।

তোমার আশ্রয়দাতা, তোমার রক্ষাকর্ত্তা, তোমার বিপদের বন্ধু, তোমার ইহকাল ও পরকালের গতি, তোমার দেবতা, তোমার বিধাতা, তোমার সকলই তোমার স্বামী এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হইবে। তিনি তোমার সকলই, তিনি তোমার পূজার দ্রব্য। বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে, দুঃখে তাঁহারই হৃদয়ে পড়িয়া কাঁদিতে হইবে; সকল সময়েই তিনি তোমার সঙ্গী, তিনিই তোমার ঈশ্বর। এ বিশ্বাস হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়া মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তবে ভালবাসা আপনা হইতেই জন্মিবে; তুমি যাহা চাও তোমার স্বামী তাহার সকলই তোমাকে দিতে পারিবেন। এ বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে যে ভালবাসার

কথা বলিতেছি তাহা আপনি জন্মিবে। যদি স্বামীকে তোমার দেবের দেব মনে করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার মনে যথার্থ ভালবাসা জন্মিবে। এ ভালবাসা বিশ্বাসের উপর অবস্থিত, মৃত্যুতেও বিশ্বাস কখনও যাইবে না, হৃদয়ের বিশ্বাস হৃদয়েই থাকিবে। এ ভালবাসাও হৃদয়ে অনন্তকাল অবস্থান করিবে। মৃত্যুর গুরুতর পরিবর্ত্তনেও এ ভালবাসার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। বিশ্বাসের উপর যে ভালবাসা অবস্থিত সে ভালবাসা মৃত্যুর পরও যাইবার নয়। সে ভালবাসা যুগযুগান্তর ধরিয়া ভালবাসার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে দুইটী হৃদয় বাঁধিয়া রাখে।

এই সংসার-আরাম-আশ্রমে সুখ দুঃখ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গিনীর উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা সঙ্গিনী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। যে ইহা ভুলিয়া যায়, সেই সংসার-আরাম-আশ্রমে অশান্তির ধূ ধূ আগুন জ্বালিয়া তুলে। সঙ্গিনী কি এবং সঙ্গিনীর সহিত স্বামীর কি কি সম্বন্ধ তাহাই বলিলাম, এক্ষণে সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সঙ্গিনীকে কি কি ভূষণে ভূষিত হইতে হইবে তাহাই বলিব।

সঙ্গিনীর ভূষণ

লজ্জা।

এক মহা শুভ দিনে, এক মহা শুভ লগ্নে যে দিন একটী প্রাণ আর একটী প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে একটী আরাম-আশ্রম নির্ম্মাণের প্রথম সূচনা করে সে দিন কত আনন্দ, কত উৎসব হইয়া থাকে। চারিদিকে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। এই শুভ অধিষ্ঠান,—যাহার স্রোত ধরণীর পৃষ্ঠে শত যুগযুগান্তর প্রবাহিত হইবে, যাহা হইতে ভগবানের সৃষ্টির নব নব বিকাশ হইবে তাহাতে আনন্দ কাহার না হয়, সে উৎসবে যোগ দিতে ইচ্ছা না হয় কাহার? তাই প্রথম যে দিন পুরুষ সঙ্গিনীর হস্ত ধরিয়া গৃহে যাইয়া উপস্থিত হন, সে দিন তাহার আত্মীয়গণ হুলু শঙ্খ-ধ্বনির ভিতর দিয়া নববধূকে মহানন্দে বরণ করিয়া গৃহে তুলেন; তখন সকলেরই হৃদয় এক নব আশার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। সে দিন স্বভাবতঃই সকলের কেবলই মনে হইতে থাকে এতদিনে পুরুষ সঙ্গিনী লাভ করিল,—এতদিনে সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল,—এইবার তাহার দ্বারা শত সহস্র পুণ্য-কার্য্যের অধিষ্ঠান হইবে,—সংসারে কত সোণার ফুল ফুটিয়া উঠিবে। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ শতধারায় পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িবে।

কৈশোরের পূর্ণ বিকাশ লইয়া, গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হইয়া স্বামীর সহিত সঙ্গিনী যে দিন প্রথম শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়—সেই দিন তাহার জীবনের এক মহা পরীক্ষার দিন। সঙ্গিনীর আগমনের পর দুই চারি দণ্ডের মধ্যেই তাহার আকার প্রকার, চলন বলন, ভাব ভঙ্গি দেখিয়াই সকলে মনে মনে একটা মতামত স্থির করিয়া ফেলেন। এমন কি তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিয়াও থাকেন, এই বধূ হইতে সংসার সুখের হইবে না, সংসারে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইবে। প্রত্যেক কার্য্যেরই প্রথম প্রবেশ কঠিন। আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া নব সংসারে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপনার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে এই সুকঠিন ব্যাপারকেও সহজ করিয়া আনিতে হইবে;—সংসার-আশ্রমের প্রতি পরীক্ষায় যশঃস্বিনী হইতে হইবে। একটু অমনোযোগী হইলেই সমূহ বিপদ,—অশান্তির আগুনে সমস্ত সংসারটা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। তাই বলি সঙ্গিনীর পরীক্ষা অসীম, কর্ত্তব্য অনন্ত।

সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে সৈনিকের যেমন তাহার উপযোগী সাজসজ্জায় ভূষিত হওয়া প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার উপযোগী ভূষণে ভূষিত হওয়া সঙ্গিনীরও প্রয়োজন। অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন সৈনিকের সমরাঙ্গণে যে দশা ঘটে, ভূষণ-বিহীনা সঙ্গিনীরও সংসার-আশ্রমে সেই দশা ঘটিয়া থাকে। সৈনিকের ভূষণ যেমন ঢাল তরোয়াল, সঙ্গিনীর

ভূষণ সেইরূপ লজ্জা, বিনয়, সরলতা, স্নেহ, মমতা, ভক্তি, প্রীতি, সেবা শুশ্রূষা, সতীত্ব।

কেমন করিয়া সঙ্গিনীগণ এই সকল ভূষণে ভূষিত হইতে পারে, তাহাই আমরা একে একে উল্লেখ করিব। রমণীর লজ্জাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভূষণ, তাই আমরা প্রথমেই লজ্জার কথা বলিব।

মুখশ্রী যতই সুন্দর হউক, বর্ণ যতই গৌর হউক যে রমণী লজ্জা-ভূষণে ভূষিত নয়—সে কোন মতেই সুন্দরী নামের যোগ্য নহে। তাই সঙ্গিনী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে লজ্জা-ভূষণে ভূষিত হওয়া প্রয়োজন। লজ্জা-ভূষণে ভূষিত হইয়া সঙ্গিনী যদি প্রথম শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে তাহা হইলে সে যতই কুরূপা হউক না কেন, তাহার লাজবিজড়িত মুখখানির প্রতি চাহিয়া সকলেরই প্রাণ গলিয়া যায়। প্রকৃতির এমনি নিয়ম যে লজ্জা-বিহীনা রমণী যতই সুন্দরী হউক, সে কিছুতেই কাহার মন আকর্ষণ করিতে পারে না। লজ্জাহীনতা বশতঃ তাহার রূপ যেন সকলেরই চক্ষে একটা মহা কুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ভাব ভঙ্গি, চলন বলন, হাসি রসিকতা, সকলই যেন কেমন একটা বিরূপ হইয়া পড়ে, কিছুতেই যেন রমণীয়তা থাকে না। একটুখানি লবণের অভাবে যেমন সমস্ত ব্যঞ্জন একেবারে বিস্বাদ করিয়া দেয়, সেইরূপ এক লজ্জাহীনতায় রমণীর রমণীয়ত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেক রমণীর লজ্জা রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

লজ্জা অর্থে ঘোমটা নহে। সাত হাত ঘোমটা টানিয়া মস্তকের

উপর দিলেই যে লজ্জা রক্ষা হইল এ কথা যেন কোন রমণী মনেও স্থান দেন না। ঘোমটায় কেবল বদনটুকু ঢাকিলেই লজ্জা রক্ষা হয় না। ঘোমটাহীনা ইংরাজ-মহিলা বা ভীলবালার যে লজ্জা নাই এমন কথা হইতেই পারে না। এই পৃথিবীতে ঘোমটাহীনা এমন বহু রমণী আছে, যাহাদের লজ্জার নিকট ঘোমটাবতীর লজ্জা দাঁড়াইতেও পারে না। লজ্জা মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে বাস করে সে ত কোন দিনও ঘোমটার আশ্রয় গ্রহণ করে না। ঘোমটায় বদন আবৃত করা লজ্জা নয়, সে যেন ঠিক অভিনেত্রীর লজ্জার অভিনয় করা। তবে যে একেবারে ঘোমটা দিতে হইবে না কিংবা মস্তকে ঘোমটা দেওয়া দোষ এ কথা আমরা বলি না বরং আমরা ঘোমটা দিবারই পক্ষপাতী, কারণ ঘোমটায় রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু কিছুরই আধিক্য ভাল নয়। ঘোমটা দিতে হইবে বলিয়াই যে একেবারে আড়াই হস্ত প্রমাণ ঘোমটা দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মস্তকের উপরে ঘোমটা থাকিলে রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; ঘোমটা মস্তকোপরি থাকাই ভাল। ঘোমটার দ্বারা একেবারে মুখ চোখ আবৃত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই তাহাতে বরং বিপদেরই সম্ভাবনা আছে। তুমি হয় তো কুটনো কুটিতে বসিয়াছ কিন্তু আড়াই হস্ত প্রমাণ ঘোমটায় তোমার মুখ চোখ আবৃত কাজেই বঁটিতে হাত কাটিবার তোমার পদে পদে সম্ভাবনা। আমাদের এক্ষণে সর্ব্বদাই রেল, ষ্টিমারে গমনাগমন করিতে হয়। এ অবস্থায় ঘোমটায় চক্ষু আবৃত থাকিলে পদে পদে

পথে হোঁচট্ খাইয়া অপরের গায়ের উপর যাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাতে লজ্জা রক্ষা তো হয়ই না বরং লজ্জার অপব্যয়ই হইয়া থাকে। লজ্জা সর্ব্বাঙ্গে জড়িত করিয়া রাখিতে হইবে, ঘোমটার কৃপায় লজ্জা রক্ষা করিতে হইবে এ কথা যেন কোন রমণী কোন দিন মনেও স্থান না দেন। লজ্জা দৃষ্টিতে, লজ্জা জিহ্বায়, লজ্জা অঙ্গভঙ্গিতে চিরদিন প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই কোন প্রবীণ লেখক লিখিয়াছেন, "আমরা অনেক লজ্জাশীলা রমণী দেখিয়াছি যাহারা প্রকৃত পক্ষে কোমল কুসুমের উপমাস্থল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের চরিত্রে নারী-হৃদয়ের বলের অভাব নাই। সে শক্তি সহিষ্ণুতায়, সাধুতায়, পরসেবায় ও আত্মসমর্পণে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়।"

সঙ্গিনীর যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবরণ লজ্জা হয়, তাহা হইলে গৃহের অনেকেই তাহার দেখাদেখি লজ্জা করিতে শিখিবে। তাহার স্নেহ যতদূর প্রবাহিত হইবে, ততদূর লজ্জা ছড়াইয়া পড়িবে। শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, ননদিনী জা, যাঁহারই নিকট যখনই উপস্থিত হইবে লজ্জাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া রাখিও। দেখিবে সকলেই তোমার প্রশংসা করিবেন, সকলেই তোমায় ভালবাসিবেন। স্বামীর নিকটও লজ্জা রাখা প্রয়োজন, কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লজ্জাই রমণীর সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যবিহীনা হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হওয়া কি কোন রমণীর উচিত? কিন্তু তা' বলিয়া লজ্জা করিয়া তাঁহার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিবে না। কেন না তিনি ও তুমি যে এক, তাহার নিকট তো তোমার কিছুই গোপন

নাই ; দুইটী প্রাণ যে ভগবান নারায়ণশিলার সম্মুখে বহুদিন এক হইয়া গিয়াছে। দুইটী হৃদয় এক হইয়া সংসার-নিকেতনে শান্তির হাট বসাইবার জন্য—অগ্নিস্পর্শে পূত প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, দুইটী বিভিন্ন পথগামী উদ্দাম স্রোতধারা সংসারের কর্ত্তব্য সঙ্গমস্থলে একত্রে মিশিয়া এক হইয়া একটী প্রবল স্রোতে অনন্তের মঙ্গলময় পথে ছুটিয়াছে, আর যে টানিলেও ছিঁড়িবে না—কাটিলেও ভিন্ন করিবার যো নাই। এমন যে আত্মায় আত্মায় মহামিলন—সেই সম্মিলিত এক আত্মার কাছে কি কোন কিছু গোপন করা চলে ? না গোপন করা উচিত ?

সরলতা ও বিনয়

লজ্জার ন্যায় সরলতা ও বিনয় সঙ্গিনীর আর একটী ভূষণ। যাহার হৃদয়ে সরলতা ও বিনয় নাই সে কখনই প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে পারে না। বৃক্ষ যেমন ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে প্রকৃত সঙ্গিনীও সেইরূপ বিনয়ভারে সতত অবনত হইয়া থাকে। বিনয় না থাকিলে ফলহীন বৃক্ষের মত স্ত্রীলোকগণও একেবারে অসার হইয়া যায়। কঠোরতাই যেমন পুরুষের পৌরুষত্ব সেইরূপ কমনীয়ত্বই রমণীর রমণীয়ত্ব। যেখানে বিনয় নাই সেখানে কেমন করিয়া কমনীয়ত্ব স্থান পাইবে? বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত রমণী হৃদয়ের কমনীয়ত্বের একেবারেই বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক সঙ্গিনীর সরলতা ও বিনয়কে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও কর্ত্তব্য।

যে সর্ব্বদাই উগ্র,—যাহার দেহ উগ্রতায় পরিপূর্ণ,—যে সর্ব্বদা লোকের সহিত উগ্রভাবে কথা কয় তাহার ভিতর কি কখন কমনীয়ত্ব থাকিতে পারে? তাই বলি যদি প্রকৃত সঙ্গিনী হইবার বাসনা থাকে;—যদি সংসারে সুগৃহিণী নাম লইতে চাও তবে ভুলিয়াও সরলতা ও বিনয়কে ছাড়িও না। সংসারে বড় হইতে হইলে আগে ছোট হইতে শিক্ষা করা উচিত। অপরের নিকট মাথা

নীচু করিতে না পারিলে জগতে কখনই বড় হওয়া যায় না। সংসারে সঙ্গিনীর স্থান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ,—কাজেই সঙ্গিনীর সকলের নিকটেই নীচু হইয়া থাকা উচিত।

আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় বঙ্গ-ললনাদিগের 'চোপা' করা একটা রোগের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকাল হইতে বিনয় শিক্ষা করিলে রমণীদিগের কখনই ঐ দোষে দোষী হইতে হয় না। যাহার হৃদয়ে বিনয় আছে সে কিছুতেই গুরুলোকের সম্মুখে 'চোপা' করিতে পারে না। 'চোপা' করা যে স্ত্রীলোকের কি ভয়ঙ্কর দোষ তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। এ দোষে যাহারা দূষিত তাহারা সঙ্গিনী নামের একেবারেই অযোগ্য। ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক প্রকৃত সঙ্গিনী কখনই গুরুজনের কথার প্রতিবাদ করিবে না, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাদের আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে।

আমরা আজ কাল প্রতি সংসারে এমন অনেক রমণী দেখিতে পাই যে, তাহাদের লঘু গুরু জ্ঞান একেবারেই নাই। তাহারা গুরুলোকের সম্মুখে চোখ মুখ ঘুরাইয়া এমন এক একটা উগ্র কথা কহিয়া থাকে যাহাতে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে পর্য্যন্ত লোকের ঘৃণা বোধ হয়। তাহাদের নিন্দা না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। যে সকলের নিকট নীচু হইতে পারে,—সকলের নিকট বিনয়াবনত হইতে পারে, তাহাকে কেহই নিন্দা করিতে পারে না,—সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে। তাই বলি প্রত্যেক সঙ্গিনীরই বিনয়ে অবনত হইবার চেষ্টা করা উচিত।

গৃহের দাস-দাসী, পুত্র-কন্যাকে লালন-পালন করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। বিনয়ে অবনত হইতে হইবে বলিয়া তাহাদের নিকটও এমন অবনত হওয়া কখনই উচিত নয় যাহাতে নিজের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। তবে তাহাদের প্রতিও উগ্র হওয়া ভাল নয়। তাহাদের শাসনে রাখা প্রয়োজন,—মাঝে মাঝে তাহাদের শাসন না করিলে তাহারা অবাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী অবাধ্য হইলে সংসারে শত বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। সুখের সংসার অশান্তির আবাস-ভূমি হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই তাহাদের মাঝে মাঝে শাসন প্রয়োজন বটে কিন্তু সে শাসন এমন ভাবে হওয়া উচিত যাহাতে উগ্র-মূর্ত্তি না ধরিতে হয়। সর্ব্বদা মানুষের প্রতি উগ্র হইয়া থাকিলে মানুষ কোন দিনই শাসিত হয় না বরং উগ্রতার ক্রমান্বয় সংস্পর্শে তাহারাও উগ্র হইয়া উঠে। মানুষকে শাসন করিতে হইলেও বিনয়ের প্রয়োজন ;—বিনয়ের সহিত গাম্ভীর্য্য, মিষ্ট কথা,—ও ভালবাসায় মানুষ যত শাসিত হয় তত শাসিত আর কিছুতেই হইতে পারে না। যে প্রকৃত সঙ্গিনী তাহার সংসারে সকলের নিকটে নম্র হওয়া একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

বিনয় যেমন সঙ্গিনীর একটী ভূষণ ; সরলতাও তেমনি তাহার আর একটী ভূষণ। যেমন সোণা পোড়াইয়া অলঙ্কার গড়িবার পর তাহা যতক্ষণ না পালিশ করা হয় ততক্ষণ তাহার উজ্জ্বলতা মোটেই প্রকাশ পায় না সেইরূপ সঙ্গিনীর প্রত্যেক ভূষণের উপর সরলতার পালিশ না পড়িলে তাহার কোনটাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে

পারে না। সরলতা ব্যতীত মৌখিক বিনয়,—বিনয় নামের অযোগ্য। কপট বিনয় বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ। সম্মুখে যতদূর সম্ভব তুমি বিনয় দেখাইলে বটে কিন্তু পশ্চাতে যদি ভ্রূক্ষেপও না কর তাহা হইলে সেরূপ বিনয় না দেখানই মঙ্গল। কপট বিনয় অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। একদিন না একদিন কপটতা ধরা পড়িবেই পড়িবে ও চিরদিনের জন্য অবিশ্বাসের পাত্রী হইতে হইবে। সরলতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। লোকের বিশ্বাস হারাইলে কিছুতেই প্রকৃত সঙ্গিনী হওয়া যায় না। যদি প্রাণের ভিতর একবার কুটিলতা আশ্রয় করে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। অচিরে সমস্ত হৃদয় একেবারে কুটিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। কুটিল স্ত্রীলোকের ন্যায় ঘৃণার পাত্রী পৃথিবীতে আর কেহই নহে;—সুতরাং যাহাতে হৃদয়ে কুটিলতা না আশ্রয় করে, পূর্ব্ব হইতে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বাল্যকাল হইতে সরলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে হৃদয় সরলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যাহার হৃদয় সরলতায় পূর্ণ তাহার নিকটে কুটিলতা কিছুতেই আসিতে পারে না।

কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর এক মহাদোষে রমণীগণ দূষিত হইয়া থাকেন। কুটিলতা হৃদয়ে থাকিলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। মিথ্যার ন্যায় মহাপাপ পৃথিবীতে আর কি আছে? মানুষ মাত্রেরই দোষ হয়, সেই দোষ যদি সরলভাবে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহা সংশোধন হইবার

উপায় হইতে পারে কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সে দোষ আর কোন দিনই সংশোধন হয় না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। অতএব সঙ্গিনীর সরলতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে সরলতায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখা সর্ব্ব প্রকারে উচিত ও কর্ত্তব্য।

স্নেহ ও মমতা

স্নেহ ও মমতা লইয়া রমণী-জীবন গঠিত হইয়া উঠে। রমণীকে স্নেহ ও মমতার আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্নেহ মমতা-হীন এমন রমণী পৃথিবীতে আছে বলিয়াই বোধ হয় না ;—যদি থাকে, নিশ্চয় জানিও তাহারা স্ত্রীলোক নামের যোগ্য নহে। সঙ্গিনীর হৃদয় স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ থাকা উচিত। সংসার-রাজ্যের যাহাকে সম্রাজ্ঞী হইতে হইবে,—দশজন দশরকমের লোককে যাহাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, তাহার হৃদয়ে স্নেহ মমতার কত বেশী প্রয়োজন তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। কন্যা, ভগিনী, সঙ্গিনী জননীরূপে সংসারে যাহার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহার হৃদয়ে স্নেহ মমতা না থাকিলে কি সংসার এক দিনের জন্যও চলিতে পারে। রমণী যখন স্নেহময়ী আখ্যা পাইয়া থাকে,—যখন দশজনে তাহাকে স্নেহময়ী বলিয়া প্রশংসা করে তখনই তাহার রমণী নামের সার্থক হয়। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে সংসারে স্নেহময়ী আখ্যা লইতে হইবে ;—দশজনে একবাক্যে বলিবে, সত্যই সে স্নেহময়ী। কঠোরতা, কর্কশতা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি যেমন সঙ্গিনীর পক্ষে একেবারেই অস্পৃশ্য, সেইরূপ স্নেহ মমতা, ভক্তি প্রীতি সঙ্গিনীর চিরদিনের

চির-সাধনার সামগ্রী। সংসারে সকলকে সমানভাবে স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে শিখিলে, সকলকে সমান ভাবে ভালবাসিলে নিশ্চয়ই সংসার সুখের হইবে,—শান্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। যদি প্রকৃত সঙ্গিনী হইবার সাধ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে স্নেহময়ী নাম গ্রহণ কর,—সঙ্গিনী নামের সার্থক হউক।

সেবা ও শুশ্রূষা

সেবা ও শুশ্রূষা করিতে রমণীই অদ্বিতীয়। লোকের সেবা-শুশ্রূষা রমণী যেমন করিতে পারে তেমন আর কেহই পারে না। সেবা শুশ্রূষার মহিয়সী রাজ্যে পুরুষ কোন দিনই প্রবেশ করিতে পারিবে না; ইহাই রমণীর নিজস্ব সামগ্রী। রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রমণী যখন দিন রাত্রি সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে তখন রমণীর সে মূর্ত্তি দেবীমূর্ত্তির ন্যায় রোগীর চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহাদের কুসুম-পেলব হস্তের স্নিগ্ধ স্পর্শে রোগীর রোগ-যাতনার অর্দ্ধেক উপশম হইয়া যায়। সেই স্নেহ মমতা পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ কান্তি, সত্যই রোগীর চক্ষে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি আনিয়া দেয়। সেবা শুশ্রূষায় বঙ্গবালার সেই চির-মহিমময়ী রূপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ। সঙ্গিনী-জীবনে যাঁহাতে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে সঙ্গিনী মাত্রেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সঙ্গিনীর এ সম্বন্ধে কি করা উচিত এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব।

সঙ্গিনী অর্থে গৃহিণী,—অর্থাৎ যিনি গৃহের কর্ত্রী। গৃহের কর্ত্রী সর্ব্বপ্রথম নিজের গুরুজনদিগের সেবা করিবেন। যাহাতে তাহাদের কোন অভাব না হয়,—যাহাতে সময় মত তাহাদের শয়ন

ভোজন প্রভৃতি হয়, যাহাতে তাহাদের রোগে সেবা শুশ্রূষার অভাব না হয় সে বিষয়ে সঙ্গিনীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সকল প্রকারে যাহাতে তাঁহারা সুখে থাকিতে পারেন, দিন রাত্রি চেষ্টা করিয়া তাহারই আয়োজনে সঙ্গিনীর সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা উচিত।

সংসারে পিতামাতার ন্যায় গুরুজন আর কেহই নাই। জননী কত কষ্টে, কত যত্নে, কত পরিশ্রম করিয়া, দিন রাত্রি কত সহ্য করিয়া তবে সন্তানকে লালন-পালন করিয়া থাকেন। যাহার কৃপায় মানুষ জগতের প্রথম আলো দেখিতে পায় তাহার নিকট তাহারা যেরূপ ঋণী সেরূপ ঋণী সংসারে আর কেহই কাহার নিকট নহে। জননীর ঋণ অপরিশোধনীয়,—এ ঋণ শোধ হইবার নহে। জননীর ঋণের শতাংশের একাংশ পরিমাণ ঋণও পরিশোধ করিবার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। যে তাহা না করে তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ নরাধম পৃথিবীতে আর কে আছে?

শ্বশুর-শাশুড়ী পিতামাতার স্থানীয়। স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা বিভিন্নতা নাই;—সুতরাং স্বামীর পিতামাতাও সঙ্গিনীর পিতামাতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এরূপ স্থলে পিতামাতাকে যেরূপ ভক্তি, মান্য, শ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করা উচিত ঠিক সেইরূপভাবে শ্বশুর-শাশুড়ীকেও ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা শুশ্রূষা করা উচিত। এক্ষণে আমাদের সমাজে নব আবহাওয়া প্রবাহিত হওয়ায় অনেক সঙ্গিনীই, শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন আর সেবা যত্ন করে না। যাহারা এরূপ করে তাহারা সঙ্গিনী নামের

একেবারেই অযোগ্য। সংসার-নিকেতনের আবর্জ্জনা স্বরূপ। তাহাদের সংস্পর্শে সংসার কোন দিনই সুখের হইতে পারে না,—চিরদিনই অশান্তির আগুনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

লেখা পড়া শেষ করিয়া পুরুষ যখন উপার্জ্জনে সক্ষম হয় তখনই স্বভাবতঃ সঙ্গিনী গৃহের কর্ত্রী হয়েন। সেই সময় শাশুড়ী কর্ত্রীপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সংসারের সমস্ত ভার পুত্রবধূর উপর ন্যস্ত করেন। তিনি আর সংসারে নির্লিপ্ত রহেন না, সংসারের বাহিরে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে নূতন রাজ্ঞী উপবেশন করেন। সংসার-সিংহাসনে উপবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীর স্কন্ধে সংসারের সমস্ত সুখোৎপাদনের গুরুভার ন্যস্ত হয়। সেই দিন হইতে সঙ্গিনীর শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবের এমনি নিয়ম যে তাহাকে একটু খিটখিটে হইতে হয়। বৃদ্ধ হইলে স্বভাব ক্রমেই নিরস হইয়া পড়ে, সে সময় লোককে সন্তুষ্ট রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় শ্বশুর-শাশুড়ী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হওয়ায় সর্ব্বদাই রাগত হইয়া পড়েন বলিয়া সঙ্গিনী তাঁহাদের সেবায় অবহেলা প্রকাশ করে। সঙ্গিনী হইতে হইলে অনেক ধৈর্য্যের প্রয়োজন। যাহারা কন্যার অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন, তাহাদের প্রতি কি কোন দিন বিরক্ত হওয়া উচিত। শ্বশুর-

শাশুড়ীর দোষ গুণ বিচার না করিয়া যে তাহাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে সেই প্রকৃত সঙ্গিনী। তাহার সংস্পর্শে সংসারে কোন অভাবই থাকিতে পারে না। যে লক্ষ্মীরূপে সংসারের সমস্ত অভাব দূর করিয়া সংসারে চির শান্তি প্রদান করিয়া থাকে।

কেবল শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিলেই সঙ্গিনীর কার্য্য শেষ হইল না। কেবল শ্বশুর-শাশুড়ীকে লইয়াই হিন্দু-সংসার নহে। হিন্দু-সংসারে ভাশুর, দেবর, ননদ, ভাশুর-পত্নী, দেবর-পত্নী ব্যতীত আরও অনেক আত্মীয় স্বজন বাস করিয়া থাকেন। সকলকেই সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা, সকলেরই সন্তোষ উৎপাদন করা, সকলেরই যত্ন সেবা করা সঙ্গিনীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। একটী সংসারে নানা প্রকৃতির লোক একত্রে বাস করে, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য, কিন্তু সেই কঠিন কার্য্যও সঙ্গিনীকে সহজ করিয়া আনিতে হইবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহাদের ভিতর পরস্পর না বাদ বিসম্বাদ হয়,—মতান্তর ঘটে। সংসারের ভিতর এক কোণে একটু আগুন লাগিলে তাহা যে ক্রমে সমস্ত সংসার ছারখার করিয়া দিতে পারে সঙ্গিনী যেন সে কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হন।

সকলকেই সমভাবে সেবা যত্ন করা সঙ্গিনীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। গৃহের আত্মীয় স্বজনগণ, যদি আহারের সময় আহার না পান, যদি শয়নের সময় শয়নের স্থান না পান, সঙ্গিনী যদি

তাঁহাদের সেবা যত্নের প্রতি দৃষ্টি না করেন তাহা হইলে তাঁহার উপর কাহারই ভক্তি থাকিতে পারে না। সেরূপ সঙ্গিনীর প্রতি গৃহশুদ্ধ সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠেন, কাজেই সেখানে শান্তি থাকিতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাশুর, ভাশুর-পত্নী, দেবর, দেবর-পত্নী, ননদ, আত্মীয় স্বজনের সেবা যত্ন হইলেই সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য শেষ হইল না। বাটীর দাস-দাসী এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত সেবা যত্ন করা সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য। অনেক সংসারে দাস-দাসীদিগকে পশুরও অধম ভাবিয়া থাকে কিন্তু তাহা ভাবা যে কতদূর অন্যায় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দু-সংসারে দাসীকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করা হয়;—ঝি অর্থে কন্যা। যখন দাসীকে কন্যা সম্বোধন করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য তখন তাহার প্রতি কন্যার ন্যায় ব্যবহার করাও হিন্দু মাত্রের উচিত? অভাবের দারুণ নিষ্পীড়নে যাহারা তোমার গৃহে খাটিতে আসিয়াছে তাহাদের প্রতি কি তোমার নির্দ্দয় ব্যবহার করা উচিত, তাহার সেবা যত্ন করাও কি তোমার কর্ত্তব্য নহে। সেবা যত্ন ও ভালবাসায় বনের হিংস্রক পশুও বশীভূত হয়—আর মানুষ হইবে না? তাহা কি কখনও সম্ভব। যত্ন কর, সেবা কর, ভালবাস দেখিবে সকলেই তোমার বশীভূত হইবে। সঙ্গিনীই সংসারের সম্রাজ্ঞী। সংসারে সম্রাজ্ঞী হইতে হইলে সকলেরই সেবা যত্ন করা প্রয়োজন।
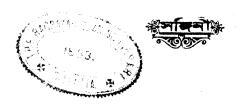
সতী-ধর্ম্ম

পৃথিবীতে রমণীর যাহা কিছু গৌরবের সামগ্রী আছে, সতীত্বই তাহার ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে রমণী সতীত্ব-ভূষণে ভূষিত তাহার আর অন্য কোন অলঙ্কার পরিবার আবশ্যক হয় না। ভগবান্ নারায়ণ-শিলার সম্মুখে পুরুষের সহিত নারীর যে ধর্ম্ম-বন্ধন সংঘটিত হয় তাহাকেই সতীত্ব-ধর্ম্ম বলা যায়। পৃথিবীতে এমন একজন ব্যক্তিও নাই যিনি সতীত্ব-ধর্ম্মের গৌরব না করিয়া থাকেন। রমণী সহস্র ভূষণে ভূষিত থাকিলেও সতীত্ব হারাইলে তাহার সমস্ত ভূষণই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সতীত্বহীনা রমণীর ন্যায় অভাগিনী রমণী পৃথিবীতে আর কে আছে? পৃথিবীতে যত কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে তাহার সমুদয়েই সতীত্ব-ধর্ম্মই রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। নারীর সতীত্ব-ধর্ম্মের মহিমা যে কত বড়—তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্তের জগতে অভাব নাই। সতী সাবিত্রী সতীত্ব-ধর্ম্মের বলে মৃত পতিকেও ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এই সতীত্ব-ধর্ম্ম যে কি তাহা প্রত্যেক সঙ্গিনীর অবগত হওয়া বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। এই সতী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সতী-ধর্ম্মের মূলে স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় যে গূঢ় শঙ্কাটি নিহিত থাকে তাহা আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ বিশেষ ভাবেই অবগত ছিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার স্থানে বিদায় লইতে চাহিলে, উলূপী অর্জ্জুনের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিলেন না, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অর্জ্জুনের ভদ্রাভদ্র জানিবার একটী উপায় যাচ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন সেই পতিপ্রাণার গৃহপ্রাঙ্গণে একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, যতদিন এই বৃক্ষটি সজীব থাকিবে ততদিন আমিও কুশলে থাকিব। উলূপী অহরহ সেই বৃক্ষটিতে জল সিঞ্চন করিতেন ও চিরদিন তাহার প্রতি চাহিয়া প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিতেন। ইহাই সতীর লক্ষণ।

স্বামী জীবিত আছেন,—স্বামী ভাল আছেন,—সুখে আছেন এইটী জানিতে পারিলেই,—স্বামী জীবিত থাকিবেন,—ভাল থাকিবেন,—সুখে থাকিবেন মনকে এই প্রবোধ দিতে পারিলেই—সতীর প্রফুল্লতা জন্মে। স্বামী পাছে না বাঁচেন,—না ভাল থাকেন,—না সুখী হয়েন এই ভয়েই সতী সর্ব্বদা কাতর হইয়া থাকেন। স্বামীর চিন্তা ভিন্ন সতীর হৃদয়ে এক মুহূর্ত্ত কালও অন্য কোন চিন্তা স্থান লাভ করিতে পায় না। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সতী-ধর্ম্মের মূল ঐ প্রকার চিন্তা এবং চিন্তা মূল বলিয়াই সতী-ধর্ম্মের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী গাম্ভীর্য্য ভাব থাকে। সাধ্বীদিগের আমোদেও নিতান্ত তরলতা প্রকাশ পায় না। তাহাদের আমোদের চলাচলি

হয় না ;—হাসি উচ্ছলিয়া পড়ে না। মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া থাকে। এই গাম্ভীর্য্য ভাবও সাধ্বীর একটী লক্ষণ।

সতী-ধর্ম্মের মূল ঐ প্রগাঢ় চিন্তা হইতে একটী অতি অদ্ভুত কাণ্ড বাহির হয়; তাহার নাম সতত স্বামী-দর্শন লালসা। উহা সতীর হৃদয়ে নিরন্তর বিদ্যমান। সতীর মনের ইচ্ছা সততই স্বামীকে দর্শন করেন। স্বামী চক্ষুর অন্তরাল হইলেই তাহার জগৎ শূন্যময় বোধ হয়। সাধ্বীদিগের স্বামীর অদর্শনে এরূপ হয় কেন? সতী-ধর্ম্মের মূলীভূত স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কাই তাহার প্রকৃত কারণ। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন তো এই চিন্তা হইতেই সতীর হৃদয়ে স্বামী-দর্শন লালসা প্রবল ভাব ধারণ করে। সতী-ধর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম ;—উহার কোন স্থলে কোন প্রকার স্বার্থের লেশ মাত্র থাকে না। স্বামী বহির্বাটীতে কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি কি জানিতে পারেন যে তাহার পতি-প্রাণা পত্নী বাতায়ন দ্বার অথবা কপাটের ছিদ্র দিয়া কতবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছেন। স্বামী নিবিষ্টমনে কাজ করিতে-ছেন, অথবা আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঁচজন বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন তাহাতে তাহার ক্লান্তি জন্মিতেছে, সেই ক্লান্তি তিনি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেছেন না কিন্তু তাহার পত্নী অলক্ষ্য স্থান হইতে দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার সেই সময়কার মূর্ত্তির অতি ঈষৎ প্রভেদ জানিতে পারেন ও সেই জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাহার তখন সততই ইচ্ছা হয় তাঁহার

কার্য্যের বিরাম হউক কথাবার্ত্তার শেষ হউক। যে ব্যক্তি শক্তি সত্ত্বে ঐ কার্য্যে বিরত না হয়,—কথাবার্ত্তা স্থগিত না করে সে সত্যই নিষ্ঠুর।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সতী-ধর্ম্মের মূল স্বামীর অনিষ্টাশঙ্কা, উহার কাণ্ড নিরন্তর স্বামী-দর্শন লালসা। এই কল্পতরুরূপ সতী-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা অসংখ্য। স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কা যদিও মূল বটে, তথাপি ঐ মূল অপরাপর বৃক্ষমূলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। উহা সতীর হৃদয় কন্দরে প্রোথিত। কদাচিৎ উহাতে কিঞ্চিৎমাত্র টান পড়িলেই সমুদয় হৃদয় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে;—কিন্তু সচরাচর ঐ মূল বড় একটা কেহ দেখিতে পায় না। স্বামী স্বয়ংও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী ও অনুসন্ধিৎসু না হইলে উহা দেখিতে পান না। সাক্ষাৎকার বাসনারূপ কাণ্ডটি মাত্র কেবল দেখিতে পান কিন্তু স্বামীর সত্যহানির ভয়, মানহানির ভয়, অর্থহানির ভয় প্রভৃতি সতী-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি সতীর চিত্ত-ক্ষেত্রে মিশিয়া থাকে। অপরেও সেগুলি কোন কোন দিন দেখিতে পায়। কোন সাধ্বী তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, বাছা! যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করায় ক্ষতি হইল কিন্তু যখন তিনি বলিয়াছেন তখন তো করিতেই হইবে, তাঁহার কথা তো মিথ্যা হইবে না। সতী পুত্র মাতৃ হৃদয়স্থিত সত্যহানির ভয়রূপ ধর্ম্ম শাখাটি দেখিতে পাইল। এইরূপে অন্যান্য শাখাগুলিও সময় বিশেষে অপরের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মবৃক্ষটি আমূলশীর্ষ অতি মনোহর ভাবে পল্লবিত। সতীর ক্রিয়াকলাপেই ঐ পল্লব। উহা অসংখ্য,—বিবিধ;—এক বর্ণাত্মক। পতি ভিন্ন সতার দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। সেই দেবতার বিধি বোধিত পূজার জন্য তাহার যাবং ক্রিয়া;—গৃহকার্য্যে গমন, স্বহস্তে রন্ধন;—স্বয়ং পরিবেশন,—দেহে অলঙ্কার ভার ধারণ। সেই জন্যই তাহার যে সকল কার্য্যে স্বামী পূজা নাই, সেরূপ কার্য্য সতীর মনেই আইসে না। মেঘদূতে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বিরহ-বিধুরা যক্ষপত্নীর যে ভাব বর্ণন করিয়াছেন তাহা কবির কল্পনা নহে।

সতী-ধর্ম্মের মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব দেখা হইল,—উহার পুষ্প কৈ? যদি জানিতে চাও তবে সতীর নিকটে গমন কর। যে বাটীতে সাধ্বী সতীর আবির্ভাব তথায় দাস-দাসী পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্টচিত্ত, কলহ পরিশূন্য, নম্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহা সেই পুষ্প সৌরভ। আরও নিকটে যাও, সন্তানদিগের সহিত আনন্দ কর, তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ,—তাহারা সরলমনা, ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন, পরস্পর ঈর্ষাবিহীন। সতী সন্তানেরা পবিত্র জঠরবাস বশতঃ সেই কুসুম সৌরভে সুরভিত হইয়া থাকে। আরও নিকটে যাইতে পার কি? অধিকার থাকে তো যাও। মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে—একটু শঙ্কাও হইবে,—বাক্য আপনা হইতেই সংযত হইবে—কিন্তু ইচ্ছা হইবে নিজে ও নিজের বলিতে যে সেখানে আছে ঐখানেই আসিয়া স্থির হইয়া থাকে। ফিরিয়া আইস, এখন ভাবিয়া দেখ তোমাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে

কি না? সংসার অসার পদার্থ নয়,—ধর্ম্ম কবিকল্পিত ব্যাপার নয়—এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে কি না? তুমিও সেই পুষ্প-সৌরভে সুরভিত হইয়া আসিলে।”

সতী-ধর্ম্মের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সঙ্গিনীর আসন যে কত উচ্চে তাহা সঙ্গিনীর সর্ব্বতোভাবে বুঝা উচিত এবং বাল্যকাল হইতে তাহারই যোগ্য হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সতী-ধর্ম্ম যে সঙ্গিনী প্রাণপণ শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া থাকে, জগতে তাহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সঙ্গিনীরই বাল্যকাল হইতেই চেষ্টা করিয়া সেই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া রীতিমত গঠিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা উচিত। যে রমণী সতী-ধর্ম্ম কি তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করে সেই প্রকৃত সঙ্গিনী।

সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য

পতি

পতির প্রতি সঙ্গিনীর কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পতির ভালবাসাই নারীর সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। যে রমণী পতির ভালবাসা হইতে বঞ্চিত তাহার ন্যায় হতভাগিনী জগতে আর কেহই নহে। যে রমণী পতির ভালবাসা লাভ করিতে পারে না,—যে রমণী পতির ভালবাসা লাভে অবহেলা করে তাহার মুখ দেখিলেও অধর্ম্ম হয়। সে যে স্থানে বাস করে সেই স্থানের মাটী পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠে। আবার যে রমণী পতির ভালবাসা লাভ করিতে পারে, যে সতী পতির ভালবাসা লাভ করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে তাহার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী জগতে আর কেহই নহে। সে যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান তাহার স্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠে,—তাহার চারি পার্শ্বে ধর্ম্ম আপন রাজ্য পাতিয়া বসেন। কমলার করুণ কটাক্ষে সে স্থানে কোন অভাবই থাকিতে পারে না।

প্রাচীন ঋষিগণ অনেক পাঠ করিয়া, অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সঙ্গিনীর স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই। স্বামীর মঙ্গলে স্বামীর সন্তোষে যত্নবতী হইলেও সে অক্ষয় স্বর্গ লাভ

করে। মানুষ সংসারে বাস করে সুখের জন্য, সে সুখের মূল হইতেছে সঙ্গিনী। সেই জন্য সঙ্গিনীর সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর বশীভূতা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গিনীর যদি স্বামীর সহিত মিল না থাকে, যদি উভয়ে একমন হইতে না পারে তাহা হইলে সংসারে সুখের আশা করা একেবারেই বিড়ম্বনা; তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। পতিই পত্নীর একমাত্র গতি;—এবং পতির ভালবাসাই সঙ্গিনীর সুখ-সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ।

পৃথিবীতে এমন একটীও রমণী নাই যে, পতির ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল না হয়, কিন্তু কি উপায়ে কি কি করিলে প্রত্যেক রমণীই সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারে তাহা কয় জন অবগত আছে। কয়েকটি বিষয়ে একটু বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিলেই প্রত্যেক রমণীই সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারে। সেই বিষয়গুলি কি তাহাই আমরা নিম্নে একে একে বলিব।

পতির সেবাই সঙ্গিনীর একমাত্র ব্রত। যেমন ঠাকুর দেবতার পূজা করা হয় সেইরূপ ভাবে পূর্ব্বে পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন দিয়া প্রত্যেক রমণীই স্বামীর অর্চ্চনা করিতেন। স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেন আর রমণীগণ রীতিমত স্বামী পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্প, বিল্বপত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিতেন কিন্তু এক্ষণে এই সভ্যতার দিনে তাহা হওয়া সম্ভব নহে—সেই জন্য প্রত্যেক সঙ্গিনীরই প্রত্যূষে উঠিয়া হৃদয়মধ্যে স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান

করিয়া পূতমনে তাঁহার অর্চ্চনা করা উচিত। সেবা যত্ন ও আন্তরিক ভক্তি প্রদান করিলে পতির ভালবাসা প্রত্যেক রমণীরই অবশ্য লাভ হইয়া থাকে।

যে কার্য্য পতির প্রিয়, যাহা করিলে তিনি সুখী হয়েন, যাহাতে তাঁহার সন্তোষ বিধান হয়—তাহাই সম্পাদনে প্রত্যেক সঙ্গিনীর প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত। কোন কার্য্যে পতি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিলে, সহাস্য বদনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মধুর সম্ভাষণে তাঁহার শ্রান্তি দুর করা উচিত। পতি কার্য্য উপলক্ষে বাহির হইবার সময়, অথবা কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার কালে সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করা রমণী মাত্রেরই উচিত। কোন কারণে সেই সময় পতি যদি বিরক্ত হইয়া অন্যায় কোন কথাও বলেন তথাপি সঙ্গিনীর সেই সময় নীরব থাকা উচিত। সেই সময় পতির সহিত কোনরূপ তর্ক করা সঙ্গিনীর পক্ষে একেবারেই কর্ত্তব্যের বাহিরে। প্রত্যেক সঙ্গিনীর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতিকে প্রদান করা উচিত। শাস্ত্রে আছে, পতি রাগান্বিত হইয়া কটুকথা বলিলে যে রমণী তাহা সহাস্য বদনে সহ্য করিতে পারে সেই যথার্থ পতিব্রতা,—সেই প্রকৃত সঙ্গিনী।

দ্রৌপদী স্বামীর ভালবাসা লাভের উপায় সম্বন্ধে সত্যভামাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হিন্দু-রমণী মাত্রেরই জানিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। কি কৌশলে তুমি স্বামীর এরূপ ভালবাসা

লাভ করিলে, এই কথা সত্যভামা দ্রৌপদীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে,—দ্রৌপদী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন আমরা এই স্থানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমি কোন কৌশল বা মন্ত্রবলে পতির এরূপ ভালবাসা লাভ করি নাই। দ্রব্যগুণে বা মন্ত্রবলে স্বামীর ভালবাসা লাভ করা যায় না। আমি কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সতত পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া একমনে পতির চিত্তানুবর্ত্তন করি। আমি প্রতিদিন স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, স্বহস্তে পাক, যথাসময়ে আহার্য্য প্রদান এবং সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। অসৎ রমণীগণের সহিত কখন বাক্যালাপ করি না। তিরস্কার বাক্য ভুলিয়াও মুখে আনি না। সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি। পরিহাস সময় ব্যতীত অযথা হাস্য করি না, দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কদাচও বাস করি না। অতি হাস্য, অতি রোষ পরিত্যাগ করিয়া সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকিতে পারি না। পতির উপদেশ অনুসারে অলঙ্কৃত ও উত্তমবসনে ভূষিত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি।"

সঙ্গিনীর আর একটী নাম সহধর্ম্মিণী। পতির ধর্ম্মের সহিত যাহার ধর্ম্ম এক তিনিই সহধর্ম্মিণী। প্রকৃত সঙ্গিনী পতির ধর্ম্মে ধর্ম্ম ও পতির অধর্ম্মে পাপ সঞ্চয় হয়, সেই জন্যই সঙ্গিনীর আর এক

নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। পতি ও পত্নী পরস্পর পাপ-পুণ্যের ভাগী। সেই জন্য প্রত্যেক সঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য পতিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত ও সাহায্য করা। পতি যদি ভুলক্রমে পাপপথে গমন করেন তাহা হইলে তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা প্রত্যেক সঙ্গিনীর চেষ্টা করা উচিত। স্বামীকে সৎপথে, সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিতে সঙ্গিনী যত সক্ষম, তেমন আর কেহই নহে। যে সঙ্গিনী তাহা না করিয়া পতিকে কেবল আত্মসুখে রত দেখিতে ভালবাসেন, তিনি একেবারে সঙ্গিনী নামের অযোগ্য। যে গৃহে পতি ও পত্নী পরস্পরে পরস্পরের ধর্ম্মপথের সহায় ও সঙ্গী, সেই গৃহই স্বর্গ। স্বর্গের সমস্ত সুখই তথায় সতত বিরাজ করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে আছে, স্বামী নিদ্রা যাইবার পর যে স্ত্রী নিদ্রা যায়, স্বামী জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই যে জাগিয়া উঠে, স্বামী ভোজন করিবার পর যে ভোজন করে, স্বামী নীরব হইলে যে কথা বলে, স্বামী দাঁড়াইলেই যে দাঁড়াইয়া উঠে ও স্বামীর নয়নে নয়ন রাখিয়া যে তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় স্থির হইয়া থাকে, সে দেবতাদিগেরও পূজা পাইয়া থাকে। তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত পুরাণের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া আছে। পতির সুখ-সন্তোষের জন্য সঙ্গিনীকে মোটামুটি কি করিতে হইবে তাহাই আমরা এইবার বলিব।

পতির প্রিয় দ্রব্য সকল যত্নপূর্ব্বক রাখা ও সেইগুলি চাহিবা মাত্র নিজহস্তে স্বামীকে প্রদান করা প্রত্যেক সঙ্গিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কার্য্য। তাঁহার দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল তাহা না চাই-বার পূর্ব্বেই স্বস্থানে গুছাইয়া রাখা উচিত। স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া স্বামীকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করান উচিত। শয়ন-গৃহের শয্যাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ভার সঙ্গিনীর উপরে, তাহা সঙ্গিনীরই করা উচিত। শয়ন গৃহ যাহাতে পতির নয়নরঞ্জন হয় তাহা সঙ্গিনী মাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সংসারে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে যখন তখন তাহা স্বামীর নিকট বলা উচিত নয়। সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া ফুরসুদ মাফিক এক সময় তাহা বলিয়া রাখা ভাল।

পতি যদি কোন দিন কোন কারণে বিরক্ত হইয়া সঙ্গিনীকে ন্যায় বা অন্যায় ভাবে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলেও তখন তাহা সঙ্গিনীর অম্লানবদনে সহ্য করা কর্ত্তব্য। ক্রোধের সময় ক্রোধ করিলে বা অন্যায় বুঝাইতে গেলে তখন তাহার কোনই ফল হয় না,—বরং অনেক স্থলে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। পতি যখন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকেন, সেই সময় অতি শান্তভাবে তাঁহার অন্যায় বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। উগ্রস্বরে স্বামীর সহিত কথা কহা উচিত নয়।

পতির উপর বৃথা অভিমান যে সকল রমণী করিয়া থাকে তাহারা প্রকৃত সঙ্গিনী নয়। প্রকৃত সঙ্গিনী কোন দিনও যৎসামান্য কারণে অশ্রুজলে বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইয়া পতির সোহাগ ও ভালবাসা পাইবার চেষ্টা করে না। পতির সম্মুখে পত্নীর অশ্রুবিসর্জ্জন করা

একেবারেই নিষেধ, কারণ অশ্রুজল দেখিলে পতির কর্ত্তব্যে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। তাই বলি, সঙ্গিনী সদা প্রফুল্লচিত্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে বটে,—তা' বলিয়া পটের বিবিটি সাজিয়া থাকিতে হইবে না। নিজে পরিষ্কার থাকিবে; পুত্র কন্যাকে পরিষ্কার রাখিবে; সংসারের প্রত্যেক সামগ্রী পরিষ্কার করিবে।

পতির প্রতি সঙ্গিনীর কর্ত্তব্যের আমরা মোটামুটি একটা আভাষ দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। যে সঙ্গিনী পতির চরণে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া,—পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজা করে, সেই প্রকৃত সঙ্গিনী।

শ্বশুর-শাশুড়ী

শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিও সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য অল্প নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পতির সহিত পত্নীর স্বাতন্ত্র্য নাই,—কাজেই পতির পিতামাতাকে নিজের পিতামাতার ন্যায় ভক্তি প্রীতি করা উচিত। শ্বশুর-শাশুড়ী সঙ্গিনীর গুরুর গুরু অর্থাৎ মহাগুরু। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে গৃহ-দেবতার ন্যায় সেবা করা প্রত্যেক সঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে সতত ভক্তিপূর্ব্বক যত্ন সহকারে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা করে, ভগবান্ তাহার প্রতি সদয় হন। তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে সঙ্গিনীকে কোন বিপদেই স্পর্শ করিতে পারে না। সেই আশীর্ব্বাদ লৌহ বর্ম্মের মত সুদৃঢ় হইয়া সমস্ত বিপদাপদকে আড়াল করিয়া রাখে।

সংসারে জনক-জননীর ন্যায় শ্বশুর-শাশুড়ী তোমার পরম হিতৈষী। সংসার যাহাতে সুখের হয়;—যাহাতে তোমরা সতত সুখে থাকিতে পার, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা। তাঁহাদের পরামর্শ না লইয়া সংসারে কোন কার্য্য করাই উচিত নয়। যাহার শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, তাহার প্রতি কার্য্যেই দায়িত্ব অসীম কিন্তু যে

সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ী বর্ত্তমান আছেন, যেথানে সঙ্গিনীর দায়িত্ব তেমন গুরুতর নয়। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে, তাঁহাদের আদেশ লইয়া চলিলে নিজের স্কন্ধে তত অধিক দায়িত্ব থাকে না পতির মাতাপিতা নিজের মাতাপিতার অধিক এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সেই অনুযায়ী তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ও আদেশ লইয়া কার্য্য করিলে সংসারে বিশেষ চিন্তাই করিতে হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকিতে নিজেকে কোন দিনই সংসারের কর্ত্রী ভাবা উচিত নয়। কোন বিষয়ে তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম হইলে অতি বিনীতভাবে তাঁহাদের তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁহাদের সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাদের মতের অনুসরণ করাই উচিত। তথাপি কদাচ তাঁহাদের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়।

আজ কাল নব্য সভ্যতার আবহাওয়া লাগিয়া, দুইচার পাতা পুস্তক পাঠ করিয়া, অনেক বঙ্গ-বালারই মস্তক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সর্ব্বদাই মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ীর পুরাতন বুদ্ধি, তাহাদের নূতন বুদ্ধির নিকট দাঁড়াইতে পারে না। তাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমতী ও সংবিবেচনাশালিনী কিন্তু তাহারা এ কথাটা একবারও ভাবে না যে, শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাদের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা পদে পদে ঠেকিয়া ঠকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা লাভ করিতে তাহাদের এখনও অনেক বিলম্ব। এ অবস্থায় প্রকৃত সঙ্গিনীর উচিত

নিজের বুদ্ধিকে জাহির না করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সেই অভিজ্ঞতাটুকু শিখিয়া লওয়া। শ্বশুর-শাশুড়ী যাহা দশ বৎসরে লাভ করিয়াছেন, বুদ্ধিমতী হইলে দুই এক মাসেই তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। এমন সুবিধা যে রমণী অশ্রদ্ধায় অবহেলায় নষ্ট করে, আমরা তাহাকে কিছুতেই প্রকৃত সঙ্গিনী নামের যোগ্য বিবেচনা করি না।

ইহা ব্যতীত এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, তুমি যেরূপ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত ব্যবহার করিবে, তোমার দেখিয়া তোমার পুত্র কন্যাগণও তোমার সহিত ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিবে। আজ তুমি বধূ আছ, দুইদিন পরে তোমাকেও শাশুড়ী হইতে হইবে। তুমি যেমন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত ব্যবহার করিবে, তোমারও পুত্রবধূর নিকট হইতে ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই আশা করা উচিত। তুমিও ঠিক তাহার নিকট সেইরূপ ব্যবহার লাভ করিবে। স্বামীকে কখনও একেবারে নিজের একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। পতির উপর পত্নীর যে অধিকার, পুত্রের উপর পিতামাতারও ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে। যে সঙ্গিনী তাহা ভুলিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর ন্যায্য অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিতে চায়, সেখানে সুখ শান্তি কিছুতেই থাকিতে পারে না। পিতামাতার অশ্রুজলে সে সংসার ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠে।

শ্বশুর-শাশুড়ীর আজ্ঞাবহা দাসীর ন্যায় প্রত্যেক সঙ্গিনীর তাহা-

দের আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। যদি তাঁহাদের আদেশ পালনে,—তাঁহাদের সুখ সন্তোষ সাধনে সঙ্গিনী সর্ব্বদা যত্ন ও চেষ্টা না করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারাও তাহার সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে কোন দিনও কুণ্ঠিত হইবেন না।

যে সঙ্গিনী নিজের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিয়া পরিবারবর্গের সুখ সুবিধার জন্য সতত চেষ্টা করে সেই প্রকৃত সঙ্গিনী। যদি নিজেকে প্রকৃত সঙ্গিনী নামের যোগ্য করিতে চাও তবে শ্বশুর শাশুড়ীকে মাতাপিতার ন্যায় ভক্তি করিতে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হইও না। তাঁহাদের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে, নিশ্চয় জানিও সংসারে কোন অমঙ্গলই প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ভাশুর ও ভাশুর-পত্নী

ভাশুর ও ভাশুর-পত্নী সংসারে যে বিশেষ ভক্তির পাত্র ও পাত্রী তাহা রমণী মাত্রেরই জানা উচিত। প্রাচীন ঋষিগণ ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীকে শ্বশুর-শাশুড়ী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় মান্য করা প্রত্যেক সঙ্গিনীরই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্বশুর-শাশুড়ী মাতাপিতার সমান। তাঁহাদের নিকট একটা অন্যায় করিলে মার্জ্জনা পাইবার আশা আছে কিন্তু ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীর নিকট অন্যায় করিলে তাঁহাদের সততই মনে হইবে যে ইচ্ছা করিয়া আমাদের তাচ্ছিল্য করিতেছে। অতএব সংসারে প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে,—ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত।

শাশুড়ীর অভাবে ভাশুর-পত্নীকেই সংসারের গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার আদেশে ও উপদেশ মতে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। শাশুড়ী বা ভাশুর-পত্নীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। শাশুড়ী গৃহিণী থাকিলে সঙ্গিনীকে যে ভাবে তাঁহার

উপদেশ অনুযায়ী সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়, ভাশুর-পত্নী সংসারের কর্ত্রী হইলেও ঠিক সেই নিয়মেই চলা উচিত। যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহকর্ত্রীর পদ তোমাকে ছাড়িয়া দেন তবেই তুমি গৃহ-কর্ত্রী হইতে পার নচেৎ নহে। তাঁহারই প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতেছ, এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। যে প্রকৃত সঙ্গিনী সে সংসারে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া সংসারের প্রতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার সংসারে কাহাকেও ছোট বা হীন ভাবে না। সে আমাপেক্ষা ছোট এইটুকু মনে উদয় হইলেই প্রাণে ঘৃণার সঞ্চার হয়। তুমি যদি একজনকে ঘৃণা কর সে কিছুতেই তোমাকে ভালবাসিতে পারে না। যিনি সংসারে ছোট বড় বিচার করিয়া চলেন, তিনি কিছুতেই সুগৃহিণী নাম লইতে পারেন না। বুদ্ধিমতী সুগৃহিণী কাহাকেও ছোট ভাবেন না। তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে এমন কি দাস-দাসীদিগের পর্য্যন্ত পরামর্শ লইতে কুণ্ঠিত হন না।

নিজের পুত্র-কন্যা অপেক্ষা ভাশুরের পুত্র-কন্যার যত্ন অধিক করা উচিত। কারণ নিজের পুত্র-কন্যার যদি কোন দিন অযত্ন হয় তাহা হইলে তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না কিন্তু ভাশুরের পুত্র-কন্যার অযত্ন হইলে তখনই তাহা দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে;—দশজনের নিন্দার পাত্রী হইতে হইবে।

শ্বশুর ও শাশুড়ীর অপেক্ষা ভাশুর-পত্নীর নিকট সঙ্গিনীর বিশেষ

হিসাব করিয়া চলা উচিত। ভাশুরের নিকট কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। ভাশুরের সম্মুখে বাহির হইবে না বটে কিন্তু তাঁহার প্রতি যত্নের ও ভক্তির যেন না কোন অভাব হয় সে বিষয়ে প্রকৃত সঙ্গিনীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

দেবর ও দেবর-পত্নী

দেবর ও দেবর-পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় দেখা উচিত। সরলভাবে মিলিয়া মিশিয়া প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া দেবর ও দেবর-পত্নীকে আপনার করিয়া লইতে হয়। তুমি বয়সে বড়, তুমি গৃহকর্ত্রী, অতএব তাহাদের সহিত তোমার মিলিলে মিশিলে সম্ভ্রমের হানি হইবে,—তাহারা তোমাকে মান্য করিবে না এরূপ ভাব প্রকৃত সঙ্গিনীর কোন দিনই মনে পোষণ করা উচিত নয়। যদি তুমি নিজের মান ও নিজের সম্ভ্রম লইয়া সর্ব্বদা দূরে দূরে অবস্থান কর,—প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সহিত না মিশ তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহাদের মন পাইবে? লোককে আপনার করিতে হইলে প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করা উচিত।

দেবর ও দেবর-পত্নীদিগের দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের গুণের পক্ষপাতী হওয়া কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যদি কোন দিন তাহাদের কোন দোষ দেখাইতে হয় তাহা হইলেও তাহা কোন লোকের সম্মুখে দেখান উচিত নয়। সুবিধা অনুযায়ী তাহাদের

অন্তরালে ডাকিয়া অতি শান্তভাবে মিষ্ট কথায় তাহাদের দোষ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। লোকের নিকট সর্ব্বদা তাহাদের গুণের কথাই বলা উচিত। যদি তাহাদের কোন দোষ থাকে, কথন কোন দিনও তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। ঘরের দোষ বাহিরে প্রকাশ করায় কোন দিনই মঙ্গল হয় না বরং অনিষ্টের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। নিজে না থাইয়া নিজে না পরিয়া পুত্র-কন্যাকে থাওয়াইলে পরাইলে যেমন মানুষ সুখী হইতে পারে, সেইরূপ দেবর ও দেবর-পত্নীকে থাওয়াইয়া পরাইয়া প্রকৃত সঙ্গিনী মাত্রেরই সুখী হওয়া উচিত।

নিজের স্বামী, পুত্র-কন্যাগণের প্রতি যে ব্যবহার করিবে দেবর, দেবর-পত্নী ও তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সংসারে তাহা ঠিক ঘটিয়া উঠে কি না সন্দেহ। তোমার ভাশুর-পত্নী, দেবর-পত্নী, তাহাদের স্বামী, পুত্র-কন্যার জন্য যে ভাবে পরিশ্রম করেন, তোমার স্বামী পুত্র-কন্যার জন্য ঠিক সেইরূপ ভাবে থাটিতেছেন না এ কথা কথনও মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত ভাব মনে আসিলেই মনকে একেবারে থাটো করিয়া দেয়। এইটুকু মনে রাখা উচিত নিজের স্বামী, পুত্র-কন্যার জন্য মানুষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু অন্য কাহার জন্য ততদুর ত্যাগ করিতে পারে না ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' বলিয়া যে সে অপরের প্রতি কর্ত্তব্য করে না, এ কথা মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়।

অপরে কি করিতেছে না করিতেছে তাহা দেখিবার তোমার কোনই প্রয়োজন নাই ; তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্য করিতে কখনও অবহেলা করিও না। যে নিজের কর্ত্তব্যটুকু বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই জগতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। কর্ত্তব্যের অপেক্ষা আর কোন ধর্ম্ম নাই। কর্ত্তব্যই জগতে সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ।

ননদিনী

ননদিনী অর্থে পতির ভগিনী। পতির সহিত পত্নীর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই তাহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। কাজেই পতির যিনি ভগিনী তিনি তোমার নিজের ভগিনীর সমতুল্য। প্রকৃত সঙ্গিনীর বয়জ্যেষ্ঠ ননদিনীগণকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ও কনিষ্ঠা ননদিনীগণকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখা উচিত! আর যাহারা সমবয়স্কা তাহাদের বন্ধুর ন্যায় দেখা উচিত। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণ অবিবাহিতকাল পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে বাস করে, সেই জন্য সঙ্গিনীর সহিত তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, কাজেই বিরোধের সম্ভাবনাও অতি অল্প।

পিতামাতার উপর পুত্রের ন্যায় কন্যার সমান অধিকার থাকিলেও, পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়,—কন্যা হয় না। বিবাহের পর কন্যা স্বামি-গৃহে গমন করিয়া পতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়; সুতরাং পিতার সম্পত্তিতে তাহার দাবী থাকিলেও, সে তাহা প্রত্যাশা করে না কিন্তু যদি কোন কারণে সে

পিতৃ-গৃহে বাস করে তাহা হইলে এইটুকু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, পিতার সম্পত্তিতে তাহারও দাবী আছে।

পতি যেমন সঙ্গিনীর ভরণপোষণের জন্য সকল রকমে দায়ী, সেইরূপ ভগিনীর ভরণপোষণের জন্যও ভ্রাতা সর্ব্বতোভাবে দায়ী। স্বামীর প্রতি সঙ্গিনীর যেরূপ দাবী, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীরও দাবী তাহা অপেক্ষা কম নহে। কাজেই স্বামী আমার,—স্বামী কেবল আমারই সুখের জন্য দায়ী,—আমাকে সুখী রাখিবার চেষ্টা করাই তাহার একমাত্র কার্য্য, প্রকৃত সঙ্গিনীর এ কথা একবারও মনে হওয়া উচিত নয়। এরূপ স্বার্থের কথা যখনই হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই অশান্তির আগুন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠে। তখনই সুখের সংসার,—শান্তি-নিকেতন অশান্তির আলয় হইয়া দাঁড়ায়। ননদিনীগণ অতি কদাচিৎ পিত্রালয়ে বাস করিয়া থাকেন। পতি-পুত্রের অভাব না হইলে কেহই পিত্রালয়ে বাস করে না। অদৃষ্টের দোষে বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যখন তাহারা ভ্রাতার আলয়ে আসিয়া বাস করে, তখন তাহাদের বিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক সঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তাহাদের এমন কোন কথা বলা উচিত নয়, যাহাতে তাহাদের প্রাণে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে। তাহারা তোমার মর্ত্ত্যে সাক্ষাৎ দেবতার স্বরূপ পতির ভগিনী;—তাহাদের নিজের ভগিনীর অপেক্ষা ভালবাসা ও যত্ন করা তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

পুত্র-বধূ

আজ যিনি সঙ্গিনী হইয়া সংসার-নিকেতনে প্রবেশ করিলেন, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুই দিন পরে তিনিই আবার শাশুড়ী হইবেন ; ইহাই সংসারের নিয়ম,—ইহাই প্রকৃতির রীতি। অতএব পুত্রবধূও যেরূপ শাশুড়ীর আদেশ অনুযায়ী প্রতি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সেইরূপ শাশুড়ীরও পুত্রবধূকে কন্যার ন্যায় প্রিয় করিয়া আদর যত্ন করা উচিত। অনেক সংসারে দেখা যায়, শাশুড়ী পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যার দিকে অধিক টানেন। ইহা শাশুড়ীর পক্ষে একেবারেই অসঙ্গত। যে সংসারে শাশুড়ী কন্যার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেন, সে সংসারে লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠেন। পুত্রবধূ অর্থে গৃহলক্ষ্মী। গৃহলক্ষ্মীকে যেমন অভক্তি ও অশ্রদ্ধা করিলে তিনি সেই সংসার অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ পুত্রবধূকে অযত্ন, অশ্রদ্ধা করিলে তথায় কিছুতেই লক্ষ্মী অবস্থান করিতে পারেন না। সে সংসার একেবারে অলক্ষ্মীর আবাসস্থল হইয়া দাঁড়ায়। সংসার সুখের করিতে

হইলে প্রাণ ঢালিয়া আদর যত্ন করিয়া,—প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিয়া শাশুড়ীর পুত্রবধূকে কন্যার ন্যায় আপনার করিয়া লইতে হয়। পুত্রবধূর যদি কোন দোষ থাকে তাহা শাশুড়ীর সর্ব্বতোভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত। বধূর নিন্দা বা কুৎসা করা শাশুড়ীর একেবারেই উচিত নয়। পুত্র যাহাকে লইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে,—যাহাকে পুত্রের সঙ্গিনী করিয়া দিলে,—যাহা হইতে তোমার বংশের ধারা জগতের পৃষ্ঠে চিরদিন খোদিত থাকিবে, তাহাকে কি কাহারও অযত্ন করা উচিত। প্রত্যেক শাশুড়ীরই মনে রাখা উচিত, পুত্র-বিনিময়ে পুত্রবধূ লইয়া আসিয়াছেন, সে যে কন্যার অপেক্ষাও শত প্রিয়। পুত্রবধূ গৃহ-স্ত্রী, ঘরের লক্ষ্মী তাহার যত্ন ব্যতীত কি সংসারে শান্তি থাকিতে পারে? তাই আমরা আবার বলি পুত্রবধূকে যত্ন করা,—ভালবাসা প্রত্যেক শাশুড়ীরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

দাস-দাসী

সংসারে সমস্ত কার্য্য একজনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কাজেই গৃহের কাজ-কর্ম্মের সুশৃঙ্খলার জন্য দাস-দাসীর প্রয়োজন হয়। বেতন দিয়া লোক রাখিলে সে নিজের মতন করিয়া কখনই সংসারের কোন কার্য্যই করে না। অর্থের জন্য যখন মানুষ কাজ করে তখন তাহা কেবল বাধ্য হইয়া করিতে হয় তাহাই সে করিয়া থাকে। প্রাণের সহিত যে কাজ করা না হয়, সে কাজ কোনদিনই সুচারুরূপে সম্পাদন হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানের এমনি নিয়ম যে, প্রত্যেক মানুষ অপর আর একটী মানুষের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহা সে ইচ্ছা করিয়াই করুক বা বাধ্য হইয়াই করুক, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে। তবে প্রত্যেক মানুষই যে এক হিসাবে অপরের জন্য পরিশ্রম করে তাহা নহে, কেহ অর্থের জন্য, কেহ স্বার্থের জন্য, কেহ বা স্নেহ-মমতার জন্য কার্য্য করিয়া থাকে। এই তিন প্রকারের মধ্যে স্নেহ-মমতার জন্য যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। তাহার কারণ অর্থের বিনিময়ে অথবা

স্বার্থের বিনিময়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে কার্য্য কোন দিনই চিরস্থায়ী হয় না। অর্থ বা স্বার্থ ফুরাইলেই কার্য্যেরও শেষ হইয়া থাকে কিন্তু স্নেহ-মমতার বিনিময়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা চিরস্থায়ী, কারণ তাহাতে স্বার্থের বা অর্থের কোন সম্পর্ক নাই।

কাজেই যে গৃহে দাস-দাসী স্নেহ-মমতার বিনিময়ে কার্য্য করে, সেখানে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। দাস-দাসীকে পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ আদরে প্রতিপালন করা প্রকৃত সঙ্গিনীর বিশেষ কর্ত্তব্য। তাহাদের বেতন দেওয়া হইতেছে, অতএব তাহারা পশুর ন্যায় কেন না পরিশ্রম করিবে, এ কথা প্রকৃত সঙ্গিনীর কোন দিনই চিন্তা করা উচিত নয়। গৃহে দাস-দাসীকে আপনার মত করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য; কাজেই সে দিকে সঙ্গিনীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে সংসারে সুগৃহিণী নাই, সেখানে দাস-দাসী এক দিনও টিকিতে পারে না। সে সংসারে প্রায়ই দাস-দাসীর পরিবর্ত্তন হয়। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, নিত্য নিত্য নূতন নূতন দাস-দাসী লইয়া সংসারের বিশেষ কোনই সাহায্য হয় না। "স্ত্রী-চরিত্র"-নামক পুস্তকে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দাস-দাসীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, এই স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন :—

"দাস-দাসী হীনজাতীয় লোক, যা' হয় তাহাই উদরস্থ করুক, আমরা ষোড়শোপচারে ভোজন করি, ইহাতে দাস-দাসীর মন

কিছুতেই ভাল থাকিতে পারে না। তাহাতে তাহারা হিংসা করে, চুরি করিতে শিক্ষা লাভ করে। যদিও তাহারা যদৃচ্ছা ভোজন করিতে পারে, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রুচিকর ও প্রচুর আহার দিলে তুষ্ট হয় ও উৎসাহের সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেবকদিগের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করা। মুখের দোষে অনেক লোক সংসারে অসুখী হয়।"

স্বর্গীয় প্রতাপ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, সেইটুকু প্রত্যেক সঙ্গিনীর মনে করিয়া রাখিয়া দাস-দাসীদিগের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য করা উচিত। যে সংসারে দাস-দাসী স্নেহ-মমতার বিনিময়ে কাজ করিয়া থাকে, সে সংসারে কোন জিনিষেরই বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে পারে না। সে স্থানে প্রতি জিনিষই যথাযথ, প্রতি কার্য্যই সুসম্পন্ন। অতএব সংসারে দাস-দাসীদিগের প্রতি বিশেষ করুণা প্রকাশ করা প্রত্যেক সঙ্গিনীরই একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

অতিথি

অতিথি-সেবা গৃহস্থ মাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্ম হওয়া উচিত। অতিথি-সেবার ন্যায় গৃহস্থের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, এ কথা শুধু হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে তাহা নহে, জগতে যত কিছু শাস্ত্র গ্রন্থ আছে তাহার প্রত্যেকখানিতেই অতিথি-সেবাই গৃহস্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এমন যে অতিথি-সেবা ধর্ম্ম তাহা সঙ্গিনীর এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সঙ্গিনীই গৃহের কর্ত্রী,—সংসারে সমস্ত ভারই তাহার উপর। সে যদি অতিথি-সেবা ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়,—তাহা হইলে প্রতিদিনই গৃহে অতিথির অবমাননা হইবে,—প্রতিদিনই অসন্তুষ্ট চিত্তে গৃহ হইতে অতিথি ফিরিবে। গৃহস্থের সংসার হইতে অসন্তুষ্ট চিত্তে অতিথি ফেরার ন্যায় আর অমঙ্গল দ্বিতীয় কিছু নাই। অতএব অতিথির যাহাতে অমর্য্যাদা না হয়, সে বিষয়ে সঙ্গিনীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পরিচিত হউন বা অপরিচিত হউন, যিনি অল্প কালের জন্য গৃহে আগমন করেন, তিনিই অতিথি। "গৃহ-ধর্ম্ম"-নামক পুস্তকে

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গৃহস্থের গৃহে অল্পকাল যিনি থাকেন,—তিনিই অতিথি।"

হিন্দু-শাস্ত্রে অতিথি-সেবার প্রচুর দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। অতিথির জন্য গৃহস্থ কতদূর পর্য্যন্ত আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহা হিন্দুর নিকট অপরিজ্ঞাত নাই। প্রবাদ আছে, এক বৃক্ষোপরি এক কপোত-কপোতী বাস করিত,—এক মহা দুর্য্যোগ রাত্রে এক ব্যাধ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কপোত তাহা জানিতে পারিয়া নিজের দেহ-বিনিময়ে অতিথি-সেবা করিয়াছিল।

ক্ষুদ্র বিহঙ্গম যদি অতিথি-সেবার জন্য নিজের দেহ প্রদান করিতে পারে তাহা হইলে মানুষ,—ভগবানের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি,—তাহার অতিথির বিষয় কি করা উচিত বা অনুচিত তাহা লেখাই বিড়ম্বনা। গৃহস্থ মাত্রেরই যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহার সেইরূপ ভাবে অতিথি-সেবা করা উচিত। গৃহে আসিয়া অতিথি অসন্তুষ্ট হইয়া না যান, সঙ্গিনীর সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। শাস্ত্রে আছে, অতিথি-সেবায় দেবতার সেবা হয়। যে গৃহ হইতে কোন দিনও অতিথি বিমুখ হয় না, সেখানে দেবতার পূজার প্রয়োজন হয় না। এক অতিথি-সেবার ফলেই সে গৃহস্থ চিরদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। গৃহে আসিয়া কেহ না বিরক্ত হইয়া যান, সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।

সেই জন্যই অতি বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক রমণীর অতিথি-

সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এইটুকু শিক্ষালাভ করা উচিত। বাল্যে পিতৃগৃহে জননীর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া প্রত্যেক রমণীর কেমন করিয়া অতিথি-সেবা করিতে হয় তাহা শিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সকলের অবস্থা সমান নহে,—চোব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দিয়া অতিথির সেবা করা সকলের সাধ্যে কুলায় না কিন্তু মিষ্ট কথা, সদ্ব্যবহার, আদর-যত্নের অভাব কাহার নাই। ইচ্ছা করিলেই প্রতি গৃহস্থই ইহা অনায়াসেই ব্যয় করিতে পারেন। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, যে সংসারে মিষ্ট কথা, সদ্ব্যবহার, যত্ন ও আদরের অভাব নাই, সে সংসারে অতিথি কখনই অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। অতিথি আসিলে মিষ্ট কথা, আদর-যত্নের অভাব যাহাতে না হয় তাহা প্রত্যেক সঙ্গিনীরই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আচার-ব্যবহার

পৃথিবীতে কেহই কাহার মুখাপেক্ষী নহে। সাধ্যপক্ষে সকলেই নিজ নিজ কার্য্য নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকে। তবে সংসারে মানুষ মানুষের উপর বিরক্ত হয় কেন? সংসার জুড়িয়া এত কোলাহল উঠে কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নয়;—আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অভাবেই মানুষ মানুষের উপর বিরক্ত হয়। যদি তোমার রীতি-নীতি ভাল হয়,—যদি তুমি সদ্ব্যবহার করিতে জান,—যদি তোমার কথা মিষ্ট হয়,—যদি তোমার আচার-ব্যবহার ভাল হয়,—যদি তোমার মন সর্ব্বদা পুণ্যের দিকে ধাবিত হয়,—যদি সকল প্রকারে তুমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা কর,—যদি ইহার জন্য তুমি একটু পরিশ্রম কর তাহা হইলে কেহই তোমার উপর কোনক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। সকলেই তোমার সহিত বসবাস করিতে ভালবাসিবে,—সকলেরই তোমার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করিবে। সঙ্গিনী হইলে কেবল যে বাটীর লোককেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা

করিতে হইবে তাহা নহে, যাহাতে প্রত্যেকেই তোমার সংস্পর্শে সুখী হইতে পারে তাহার জন্য তোমার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। যেমন আকাশে চন্দ্র উদিত হইয়া দূরে—বহু দূরে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে জ্যোৎস্নালোকে হাসাইতে থাকে, প্রকৃত সঙ্গিনীও ঠিক সেইরূপ নিজের সংসার মধ্যে থাকিয়া আশে পাশে চারিদিকস্থ সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে এক অনুপমের আনন্দ উৎপাদন করিতে থাকে। আচার-ব্যবহার উত্তম ব্যতীত ইহা আর কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যাবতী,—সর্ব্বগুণে গুণবতী এমন কি রন্ধন-বিদ্যায় সুনিপুণা হইলেও সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। প্রকৃত সঙ্গিনা হইতে হইলে আচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আচার-ব্যবহার ভাল না হইলে রমণী কথনই লোকের সুখ্যাতির পাত্রী হইতে পারে না।

১

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়ী না হইলে সংসারে কেহই সুখী হইতে পারে না। ধনী, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত যিনিই হউন, সকলেরই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। মিতব্যয়ী না হইলে অভাব কিছুতেই ঘুচিতে পারে না, লক্ষ টাকাও এক মাসে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। অন্যায় ব্যয় করিলে অভাব হইতেই হইবে,—আর অভাব হইলে সংসার কিছুতেই সুখের হইতে পারে না।

সংসারে অপর যে কেহই মিতব্যয়ী হউক তাহাতে কোনই ফল দর্শে না; কারণ সংসারের যিনি কর্ত্রী,—যাঁহার উপর সংসার নির্ভর করিতেছে, সর্ব্ব প্রথম সেই সঙ্গিনীর মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। সংসারে সঙ্গিনী যদি মিতব্যয়ী না হন তবে সে সংসারে কিছুতেই অভাব ঘুচে না। দৈন্যের হাহাকারে সে সংসার দিন দিন একেবারে ভরিয়া উঠে। যিনি সঙ্গিনীর সমস্ত কর্ত্তব্য অবগত হইয়া প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে চান, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। বাল্যকাল হইতে মিতব্যয়ী না শিক্ষা করিলে সঙ্গিনীর সমস্ত শিক্ষাই বৃথা হইয়া যায়। মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে "পারিবারিক জীবন" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা

প্রত্যেক সঙ্গিনীরই জানিয়া রাখা উচিত। আমরা এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বড় ঘরের গৃহিণী হউক, আর ক্ষুদ্র ঘরের গৃহিণী হউক, প্রত্যেকেরই আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত; তাহা হইলে আর দৈন্যের ভয় থাকে না। অনেকে ঋণ করিয়াও দান করিতে ভালবাসেন কিন্তু সে প্রকার দানে কোনই পুণ্য নাই বরং ঋণ শোধ করিতে না পারিলে পাপ সঞ্চয় হয়। দাতা নাম অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ নামে অধিক মহত্ব প্রকাশ করে। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে অল্প আয়েও সুশৃঙ্খলরূপে পরিবারের ভরণপোষণ সমাধা হইতে পারে। স্বামীর যাহা আয় তাহাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পাড়া প্রতিবাসীর ধন দেখিয়া মনোক্ষুণ্ণ হওয়া কেবল কষ্টের কারণ। এই কারণ কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দিতে ক্রটী করেন না, ইহা কেবল তাহাদের অজ্ঞতার ফল। কখন কখন মিতব্যয়িতা কৃপণতা নামে কথিত হয় কিন্তু মিতব্যয়িতা ও কৃপণতা এক সামগ্রী নহে।"

কৃপণতা ও মিতব্যয়িতায় এই দু'য়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কৃপণ অর্থে যিনি ন্যায্য ব্যয় ও খরচ করিতে কুণ্ঠিত কিন্তু মিতব্যয়ী তাহা নহে। যিনি আয় ব্যয় বুঝিয়া চলেন তাহাকেই মিতব্যয়ী বলে। তাই বলি যদি প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে চাও,—যদি সংসার সুখের করিতে চাও তবে মিতব্যয়ী হও।

রন্ধন

জগতের আহারের বন্দোবস্তের ভার নারীর উপর। পুরুষ খাটিয়া পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, নারী তাহাই ব্যয় করিয়া পুরুষের আহারের বন্দোবস্ত করে। যাহার অভাবে জীবন এক দিনের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না, যাহার দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া মানুষকে কার্য্যক্ষম রাখে তাহারই সুবন্দোবস্ত করিবার ভার নারীর হস্তে। কাজেই নারীর রন্ধন বিষয় শিক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে রমণী রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শী নহে, সে কিছুতেই সঙ্গিনী নামের যোগ্য হইতে পারে না।

আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি সংসারেই রন্ধনের জন্য লোক নিযুক্ত আছে। ইহা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায় আজ কাল রন্ধন করিতে রমণী মাত্রই অক্ষম কিন্তু পূর্ব্বে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতি, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনদিগকে ভোজন করান প্রত্যেক রমণীই একটা গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন,—রন্ধন-বিদ্যাই তখন নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ছিল। সংসারে রন্ধনের ন্যায় বিদ্যা নাই,

যে রমণী রন্ধনে অদ্বিতীয় তাহার ন্যায় গুণবতী রমণী পৃথিবীতে আর কেহই নহে,—তিনিই প্রকৃত সঙ্গিনী নামের যোগ্য।

প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে সেই জন্যাই রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করা বাল্যকাল হইতে উচিত। এ বিদ্যা পুস্তক পাঠ করিয়া শিখিতে পারা যায় না,—অথবা বিনা পরিশ্রমেও শিক্ষা লাভ হয় না। যেমন কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া হাতের পরিষ্কার লেখা হয় না, সেইরূপ উনানের নিকট যাইয়া হাতা বেড়ী না ধরিলে, এ বিদ্যা কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। রন্ধন-বিদ্যা বড়ই কঠিন বিদ্যা, রীতিমত পরিশ্রম করিয়া না শিখিলে কেহই ইহাতে সুনিপুণা হইতে পারে না। সেইজন্যাই প্রত্যেক নারীর অতি শৈশবকাল হইতেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করা উচিত। অতি বাল্যকাল হইতে জননী যখন রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন তখন তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তিনি কি ভাবে রন্ধন করেন' তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে এই বিদ্যা ধীরে ধীরে আয়ত্ত হইতে থাকে। এই বিদ্যা একবার আয়ত্ত করিতে পারিলে ভুলিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই জন্যাই অতি বাল্যকালে জননীর নিকট হইতে এই বিদ্যাটা শিখিয়া রাখা প্রত্যেক সঙ্গিনীরই একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

যে সঙ্গিনী রন্ধন-বিদ্যায় একেবারেই পারদর্শী নহে, তাহাকে নারী বলাই চলে না। যেমন বৃক্ষে ফুল না ফুটিলে তাহার কোনই শোভার বিকাশ হয় না, সেইরূপ সঙ্গিনী রন্ধন না জানিলে তাহার নারীত্বের কিছুই বিকাশ প্রাপ্ত পায় না। রাশি রাশি পুস্তক

পড়িয়া বিদ্যাবতী হইয়া,—অপরূপ রূপ লইয়া রূপসী হইয়া,—সর্ব্বগুণে গুণময়ী হইয়াও কোনই ফল নাই, যদি সঙ্গিনীর রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা না থাকে। এইটুকু প্রতি রমণীরই মনে রাখা উচিত যে, রন্ধন-বিদ্যাই রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে রমণী রন্ধন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, সেই কেবল প্রকৃত সঙ্গিনী নাম লইবার যোগ্য। এ সংসারে রন্ধনে যিনি অদ্বিতীয়, তিনিই কেবল প্রকৃত সঙ্গিনী। ভবিষ্যতে যাহার সঙ্গিনী হইতে হইবে তাহার বিশেষ পরিশ্রম করিয়া রন্ধন-বিদ্যায় পরিপক্ক হইবার চেষ্টা করা উচিত।

সীবন

রন্ধনের ন্যায় সীবন শিক্ষা করাও প্রতি রমণীর কর্ত্তব্য। সীবন অর্থে সেলাই। গৃহস্থ সংসারে সেলায়ের প্রয়োজন প্রতিদিনই হইয়া থাকে। প্রত্যেক জিনিষটী যদি দর্জ্জির দোকানে পাঠাইয়া বা রিপু-কর্ম্ম ডাকাইয়া সেলাই করাইতে হয় তাহা হইলে গৃহস্থের কিছুতেই চলিতে পারে না। প্রতি জিনিষটি যদি পয়সা ব্যয় করিয়া সেলাই করাইতে হয় তাহা হইলে গৃহস্থ কখনই তাহা পারিয়া উঠেন না; সেই জন্যই সীবন শিক্ষা করা রমণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বাল্যকালে রন্ধন শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সীবন শিক্ষাও ধীরে ধীরে করা উচিত। নারী সেলাই করিতে জানে না, এ কথা লোক সমাজে প্রকাশ পাইলে স্ত্রীলোকের লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকে না। প্রত্যেক রমণীরই বাল্যকাল হইতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা আয়ত্ত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে আর কোনই অসুবিধায় পড়িতে হয় না। যে সকল বিষয় শিক্ষা লাভ না করিলে রমণী, রমণী-নামের যোগ্য হয় না, সীবনও তাহারই ভিতর একটী। সেইজন্যই অতি বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক রমণীর সীবন শিক্ষা করা উচিত।

সঙ্গিনী যদি সীবন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সংসারে অনেক ব্যয় লাঘব হয়। বালক-বালিকা-দিগের পেনী, ফ্রক প্রভৃতি গৃহেই সেলাই করা উচিত। সামান্য সামান্য জিনিষগুলি যদি গৃহে সীবন করা হয় তাহা হইলে অনেক ব্যয়ের লাঘব হয়। অতএব প্রত্যেক সঙ্গিনীর সীবন শিক্ষা করা বাল্যকাল হইতেই কর্ত্তব্য।

আনন্দময়ী

রমণী মাত্রেরই আনন্দময়ী হওয়া কর্ত্তব্য। সংসারে যদি সঙ্গিনী আনন্দময়ী না হন,—যদি বিমল হাস্যে তাহার মুখখানি ভরিয়া না থাকে তাহা হইলে সে সংসার কিছুতেই আনন্দময় হয় না। সংসার-জাঁতায় পেশিত হইয়া পুরুষকে দিন রাত্রিই হাহাকার করিতে হয়,—মন সর্ব্বদাই নানা চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া পড়ে। উত্তপ্ত তপন-তাপে পতিত পথিকের ন্যায় এ অবস্থায় মানুষ ব্যাকুলভাবে বৃক্ষ ছায়ার অনুসন্ধান করিতে থাকে। সংসারে পুরুষ একটু-খানি সুখের জন্য,—একটুখানি আরামের জন্য,—একটুখানি শান্তির জন্য সদাই ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়; তখন আপনা হইতেই প্রাণ একটুখানি সুখ-শান্তির আশায় গৃহের দিকে ছুটিতে থাকে।

কিন্তু গৃহ তো একটা প্রকাণ্ড জড় পদার্থ; সে সুখ শান্তি প্রদান করিবে কিরূপে? তাহার তো সুখ শান্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই, তবে মানুষ সুখ শান্তির আশায় ব্যাকুল হইয়া গৃহের দিকে ছুটে কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, গৃহ সুখ শান্তি দিতে

পারে না বটে কিন্তু গৃহ-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী যিনি, সেই সঙ্গিনীর নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে হৃদয় শান্তিতে ভরিয়া যায়। গৃহ কিছুই নহে, গৃহের গৃহিণীই সব। সংসারে নারী জাতিই মানুষকে সুখ শান্তি প্রদান করিতে একমাত্র সক্ষম। রমণী ভিন্ন অন্য আর কেহই পুরুষ জাতিকে সুখ সম্প্রদান করিতে পারে না। যখন পুরুষ উত্তপ্ত রৌদ্র কিরণে বিপর্য্যস্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে, তখন নারী জাতিই কেবল তাহার শরীরে সুশীতল সমীরণ সঞ্চালন করিয়া তাহাকে চিরসুখী করে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পুরুষ যখন গৃহে ফিরে তখন একটু সুখের প্রত্যাশা করিয়াই ফিরে,—এরূপ অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া সে যদি সঙ্গিনীকে আনন্দময়ী দেখিতে না পায়—তাহা হইলে তাহার প্রাণের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে,—তখন সততই মনে হয় বুঝি গৃহের ন্যায় অশান্তির স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। যাহার নিকট মানুষ আনন্দের প্রত্যাশা করিয়া গমন করে, সে যদি নিরানন্দে থাকে তাহা হইলে আর মানুষ যাইবে কোথায়? সেইজন্যই সঙ্গিনীর চির হাস্যময়ী,—চির আনন্দময়ী হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। সর্ব্ব দুঃখ হৃদয়ে লুকাইয়া সঙ্গিনীকে পতির সম্মুখে সদানন্দ-ময়ী হইতে হইবে; কারণ সংসার-চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত পরিশ্রান্ত পুরুষ গৃহে দুঃখের আশা করে না।

আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় অনেক রমণী ভালবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য স্বামী গৃহে ফিরিলে মুখখানি ভার করিয়া

মানভরে বসিয়া থাকেন। স্বামী সাধ্য সাধনা করুন,—স্বামী মান ভঞ্জন করুন, তাঁহাদের ইহাই ইচ্ছা—কারণ ইহাতে প্রাণে তাঁহাদের বেশ একটু আনন্দ লাভ হইয়া থাকে কিন্তু সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মস্রোতে অঙ্গ ভাসাইলে কাব্য ও কবিতার আর সময় একবারেই থাকে না, সংসারের ঘর্ষণে এ সমস্ত কর্পূরের ন্যায় একেবারেই উবিয়া যায়। পুরুষ সংসারে সমস্ত দিন খাটিয়া গৃহে আসিয়া যদি স্ত্রীর হাস্য বদন না দেখে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় অশান্তিতে ভরিয়া উঠে, গৃহ হইতে অবিলম্বে পলাইবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পুরুষ শান্তির প্রত্যাশা করিয়া গৃহে আসিয়া যদি স্ত্রীর সহিত কলহ বিবাদ বিসম্বাদ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট গৃহ একটা অগ্নিকুণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সঙ্গিনী আনন্দময়ী না হওয়ায় গৃহে গৃহে যে কত হাহাকার উঠিতেছে তাহার স্থিরতা করে কে? সঙ্গিনীর একটু সামান্য ভুলে কত সুখের সংসার একেবারে শ্মশানে পরিণত হইতেছে। এ পৃথিবীতে কোন কার্য্যই কারণ ব্যতীত হইতে পারে না। কারণ না থাকিলে কি লোক জানিয়া শুনিয়া গৃহ ছাড়িয়া নরকের পথে গমন করে। গৃহে সুখ ও শান্তি পাইলে কে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সুখের জন্য গমন করে? যে সঙ্গিনী স্বামীর হৃদয়ের অবস্থা না বুঝিয়া গৃহ অশান্তির আলয় করিয়া তুলেন, তাঁহার স্বামীই গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র শান্তি লাভের আশায় গমন করেন। সেইজন্য প্রকৃত সঙ্গিনীর

হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা গোপন করিয়া স্বামীর সম্মুখে আনন্দময়ী হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

সকল সময়েই আনন্দময়ী, চির হাস্যময়ী হও, অন্ততঃ স্বামী যখন গৃহে ফিরিবেন, সেই সময়ের জন্যও আনন্দময়ী হও, ইহাই আমাদের সঙ্গিনীর নিকট একমাত্র প্রার্থনা। হাস্যময়ী ও আনন্দময়ী হওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে, একটু চেষ্টা করিলে সকলেই আনন্দময়ী হইতে পারে। নিজে সুখী না হইলে সংসারে কেহই আনন্দময়ী হইতে পারে না, এইজন্যই আমরা অনুরোধ করি, স্বামীর সম্মুখে প্রাণপণ চেষ্টায় হৃদয়ে দুঃখ গোপন করিয়া আনন্দময়ী হও। যখন নিজে আনন্দময়ী হইয়া স্বামীকে আনন্দময় করিতে পারিবে, যখন স্বামী তোমার নিকটে থাকিলে স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন, তখন দেখিবে তোমার সহস্র ক্লেশ বাত্যাতাড়িত মেঘের ন্যায় হৃদয় আকাশ হইতে মুহূর্ত্তে উড়িয়া যাইবে। সমস্ত সংসার মহানন্দে ভরিয়া উঠিবে। চারিদিকে সুখ, চারিদিকে শান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। সে সংসারে দুঃখ দৈন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না। যে রমণীর মুখে হাসি পুষ্পের মত সতত ফুটিয়া থাকে, সেই প্রকৃত সঙ্গিনী।

সু-গৃহিণী

সংসারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে কত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সংসারে গৃহিণীর কর্ত্তব্যের ন্যায় কঠিন কার্য্য পৃথিবীতে আর কিছুই নহে। সু-গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মোটামুটি প্রধান প্রধান বিষয়গুলি যাহা সঙ্গিনী হইতে হইলে প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত, তাহাই সংক্ষেপে আমরা একে একে বলিব।

গৃহিণীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সংসারের সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। গৃহ-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই তাঁহার পক্ষে সামান্য ও অনাবশ্যকীয় এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। একটু যত্ন করিয়া বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে অনেক সামান্য সামান্য বিষয়ে ব্যয়ের লাঘব হইবে ও সংসারে অনেক সামগ্রীই অল্প ব্যয় হইবে।

সু-গৃহিণীর কর্ত্তব্যগুলি বাল্যকাল হইতেই জননীর নিকট জানিয়া লইয়া বিশেষ ভাবে মনে করিয়া রাখা উচিত। কোন্ জিনিষের কিরূপ দর, কোন্ দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, কোথা

হইতে আসিলে ঐ সকল দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সু-গৃহিণীর জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

সংসারের সমস্ত খরচের মাসিক ও দৈনিক রীতিমত হিসাব রাখা উচিত। মাসের প্রথমেই কোন্ কোন্ বিষয়ের খরচ কত হইবে,—কত কম খরচে চলিতে পারে, সেই বিষয়ের একটা হিসাব করিয়া সেই হিসাবে খরচ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে পারিলে সংসারের ব্যয় অতি সুশৃঙ্খলার সহিত ও অতি অল্প ব্যয়ে হইয়া থাকে।

মোটামুটি হিসাব রাখিলেই অনেকে ভাবেন যথেষ্ট হইল কিন্তু সু-গৃহিণীর কর্ত্তব্য তাহা নহে। যিনি ভাল গৃহিণী তিনি যখন যাহা খরচ করিবেন তাহার প্রত্যেকটি হিসাবে লিখিয়া রাখিবেন, কোন বিষয়েই হিসাবে না লিখিয়া তিনি ব্যয় করিবেন না। দিনের মধ্যে যখন যাহা খরচ হইবে তাহা এক পয়সা হউক অথবা একশত টাকাই হউক, সমস্তই লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে হিসাব দেখিয়া খরচ অধিক হইতেছে কি না তাহা অতি সহজেই জানিতে পারা যায় এবং সেই অনুযায়ী ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারা যায়। স্বামীর যেরূপ আয় তাহারই ভিতর সমস্ত বুঝিয়া হিসাব করিয়া সমস্ত খরচ সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই সু-গৃহিণীর কার্য্য। অপব্যয়ীর ন্যায় দোষ গৃহিণীর পক্ষে আর কিছুই নাই। সু-গৃহিণী হইতে হইলে সংসারের ব্যয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বুঝিয়া ব্যয় করিলে সংসারে কোন অভাবই হইতে পারে না।

সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ ধারে ক্রয় করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে,—সমস্ত দ্রব্যই নগদ কেনাই উচিত। ধারের অপেক্ষা নগদ জিনিষ খরিদ করিলে নিশ্চয়ই সস্তা হইবে এবং নগদ কিনিতে হয় বলিয়া ব্যয়ও বেহিসাবে হইতে পারিবে না। যিনি প্রকৃত সঙ্গিনী, যিনি গৃহের সু-গৃহিণী তিনি যাহাতে সংসারের সমস্ত জিনিষ নগদ খরিদ করিতে পারা যায় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

যে স্থানে যে দ্রব্য স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়, সেই স্থান হইতেই সেই দ্রব্য কিনিয়া আনা উচিত। একটু কষ্ট করিয়া একটু দূরে যাইতে হইবে বলিয়া বেশী দাম দিয়া নিকট হইতে জিনিষ খরিদ করা উচিত নয়। সংসারে দুই পয়সা সাশ্রয় হইলেও যে কত উপকার হয় তাহা লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। অতএব সঙ্গিনী মাত্রেরই সংসারে যাহাতে দুই পয়সা সাশ্রয় হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

যদি কোন দ্রব্য নিতান্তই ধারে লইতে হয় তাহা হইলে টাকা দিবার সময় তাহাদের ঠিক কড়ার মত দেওয়া উচিত। টাকার জন্য যদি কাহাকেও ফেরাফিরি করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যিনি টাকা দিতে লোককে কষ্ট দেন তাঁহাকে কেহই বিশ্বাস করে না। প্রকৃত সঙ্গিনীর এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন দ্রব্যই ধারে খরিদ করা উচিত নহে, যদি নিতান্তই ধারে খরিদ করিতে হয় তাহা হইলে কড়ার অনুযায়ী টাকা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কোন্ জিনিষের কি দাম,—কোন্ জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়,—কোন্ জিনিষটির পরিবর্ত্তে কোন্ জিনিষটি কিনিলে সংসারে অল্প খরচে চলিতে পারে তাহার জন্য দিন রাত্র চিন্তা করা উচিত। এমন অনেক গৃহিণী আছেন, যাঁহারা কোন দ্রব্য সস্তা দেখিলেই খরিদ করিয়া বসেন কিন্তু তাহা খরিদ করিয়া ফল কি? যাহা সংসারের প্রয়োজন লাগিল না তাহা খরিদ করা,—অর্থের অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সখ করিয়া অনর্থক কতগুলা বাজে জিনিষ কিনিয়া অর্থের অপব্যয় করা কখনই প্রকৃত সঙ্গিনীর উচিত নয়।

গৃহিণী মাত্রেরই অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু দান ধ্যানে ব্যয় করা উচিত। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে বা সংসারে যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া ফেলা যায় তাঁহাই বিবেচনা করিয়া গরীব দুঃখীকে প্রদান করিলে অনেক সময়ই সংসারে সুখের উদয় হয়। প্রকৃত সঙ্গিনীর অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু দান করা কর্ত্তব্য।

প্রতি মাসে সংসারে যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্তই একেবারে আনান উচিত। এক সঙ্গে জিনিষ ক্রয় করিলে অনেক সস্তায় হয় ও জিনিষের ব্যয়ও অল্প হয়। ইহা ব্যতীত কোন দ্রব্যের সহসা প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য আর বাজারে ছুটিতে হয় না।

সংসারে কাহাকেও অবিশ্বাস করা সঙ্গিনীর উচিত নয় কিন্তু তাহা বলিয়া অসাবধান হওয়াও উচিত নয়। সঙ্গিনী মাত্রেরই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বাজার হইতে কোন দ্রব্য

আসিলে সঙ্গিনীর হিসাব করিয়া সমস্তই মিলাইয়া লওয়া উচিত। জিনিষ ঠিক আসিল কি না, দাম অধিক পড়িল কি না,—ওজনে ঠিক আছে কি না এই সকল মিলাইয়া দেখিয়া জিনিষ গৃহে তোলা উচিত; একটু সামান্য পরিশ্রমের জন্য অনেক সঙ্গিনী এই সকল বিষয়ে অবহেলা করেন,—কিন্তু প্রকৃত সঙ্গিনীর তাহা করা কিছুতেই উচিত নয়।

গৃহে সমস্ত জিনিষ যথাযথ স্থানে গুছাইয়া রাখা উচিত। অনেক সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় কোন দ্রব্য চাহিলে তাহা সংসারে থাকা সত্ত্বেও চাহিবা মাত্র পাওয়া যায় না; তাহা খুঁজিয়া আনিয়া দিতে দিতে অনেক সময় তাহার প্রয়োজনই ফুরাইয়া যায়। সমস্ত গৃহের জিনিষ পত্র এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে যাহাতে সে গৃহে সঙ্গিনীর থাকা না থাকা দুই সমান। সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে রাখিয়া, সংসারে যাহাতে কিছুমাত্র বিশৃঙ্খল উপস্থিত না হয় প্রকৃত সঙ্গিনীর সে বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখা উচিত। সংসারে কোন্ দ্রব্যটি কোন্ স্থানে আছে তাহা সু-গৃহিণীর একেবারে কণ্ঠস্থ থাকা প্রয়োজন।

কোন্ দ্রব্য কি ভাবে রাখিলে নষ্ট হয় না ইহা প্রকৃত সঙ্গিনীর জানা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সঙ্গিনী এ বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ায় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ অতি অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। জিনিষ পত্রে সামান্য একটু যত্ন থাকিলেই কোন জিনিষই অপচয় হয় না।

দুগ্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রত্যহ ধারে আসে ও মাসকাবারে তাহার দাম শোধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা নিজ হস্তে প্রত্যহ তাহাদের খাতায় তুলিয়া দেওয়া উচিত। দেনা পাওনা বিষয়ে সংসারে কিছুমাত্র অবহেলা করিতে নাই।

সংসারে কোন্ দ্রব্য কোথায় আছে সঙ্গিনীর তাহা কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। সংসারে সমস্ত জিনিষ সঙ্গিনীর কণ্ঠস্থ থাকিলে আর কোন দ্রব্য হারাইতে পারে না। হারাইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে ও যথাসময়ে তাহার অনুসন্ধান হইতে পারে।

সত্য কথা কহা সকলেরই উচিত। সংসারে মিথ্যা কহিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। যাহাতে নিজের বা পরের ক্ষতি হইতে পারে তাহা করা সঙ্গিনীর পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। সদ্ব্যবহার করিতে কাহার বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না।

সঙ্গিনীর মিষ্টভাষী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কথা কর্কশ হইলে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সহিত কথা কহিতে চায় না, নিতান্ত বাধ্য না হইলে তাহার সহিত আর কেহই কথা কয় না! মিষ্ট কথায় সকলেই সন্তুষ্ট,—যে মিষ্ট কথা কয় তাহার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকে। এ সংসারে মিষ্ট কথার ন্যায় আর কিছুই নাই, মিষ্ট কথা কহাও একটা বিশেষ কিছু কঠিন কার্য্য নহে। সঙ্গিনীর ইহা একটী অলঙ্কার স্বরূপ।

সঙ্গিনীর মিষ্টভাষী হওয়াও যেরূপ প্রয়োজন, লজ্জাশীলা হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজন। যে রমণীর লজ্জা নাই তাহার সহস্র রূপ থাকিলেও সে কুৎসিত। লজ্জার ন্যায় সঙ্গিনীর আর কিছুই সৌন্দর্য্য নাই।

দয়া সঙ্গিনীর পক্ষে একটী বিশেষ আবশ্যকীয় সামগ্রী। যাহাকে দশজনকে লইয়া দশজনের সঙ্গে থাকিতে হয় তাহার হৃদয়ে দয়া না থাকিলে সংসার নিতান্ত কঠোর হইয়া উঠে। যদি কেহ কাহারও উপর এ সংসারে দয়া না করিত,—যদি সকলেই সকলের দুঃখ দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিত তাহা হইলে এই সংসার কোন দিনই আরাম আশ্রম হইতে পারিত না,—মরুভূমির ন্যায় একেবারে শুষ্ক নিরস হইয়া পড়িত।

সঙ্গিনীর হৃদয়ে দয়া থাকা যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ মায়া থাকাও বিশেষ আবশ্যক। মায়া সংসারে নর-নারীকে সংসার-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিবার রজ্জুস্বরূপ। যাহার হৃদয়ে মায়া নাই সে কিছুতেই সংসারে থাকিবার উপযুক্ত নহে।

সঙ্গিনীর পুণ্যের দিকে সর্ব্বদা মন থাকা উচিত। পাপের দিকে যাহার মন ধাবিত হয়, সে সংসারে কোন দিনই সুখী হইতে পারে না। সংসার-আশ্রম করিতে হইলে সঙ্গিনীর বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাপ-পুণ্য হিসাব করিয়া চলা উচিত। প্রকৃত সঙ্গিনীর এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সংসারে পুণ্যকার্য্যই একমাত্র সুখ-শান্তির পথ।

সংসারে গুরুজনকে মান্য করিয়া চলা উচিত। যে গুরুজনকে মান্য করে না তাহার ন্যায় অসভ্য আর কেহই নহে। সে সঙ্গিনী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি যত্ন, তাঁহারা যাহা ভালবাসেন তাহাই রন্ধন, তাঁহাদের শয়নের জন্য বিছানা প্রস্তুত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ভার সঙ্গিনীর উপর,—প্রকৃত সঙ্গিনী মাত্রেরই ইহা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

দেবর ও দেবর-পত্নীকে নিজের ভাই ভগিনীর মত ভাবা উচিত ও সংসারের অন্যান্য সকলকে নিজের মত দেখা সঙ্গিনীর কেবল কর্ত্তব্য নয়, ইহাই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। সঙ্গিনী যদি গৃহের সমস্ত সুখ-শান্তির চেষ্টা অহরহ না করেন তাহা হইলে সংসার কোন দিনই সুখের হইতে পারে না।

স্বামী-সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে তবে সঙ্গিনীর জীবনের সার্থকতা হয়। যে নারী স্বামীর প্রতি অবহেলা করে সে ইহজন্মে সকলের নিকট হেয় হইয়া সারা জীবন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরকালে আবার নরকেই গমন করে। সকল দেশে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে,—"যে রমণী-জীবন স্বামী-সেবায় নিয়োজিত নয় তাহা অসার।

যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা নিয়মিত সময়ে প্রদান করা উচিত। কোন দ্রব্য কাহারও নিতান্ত প্রয়োজন দেখিলে তাহাকে সেই দ্রব্যটি দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। মোট কথা

প্রকৃত সঙ্গিনীর সাধ্যমত সকল সময়ে সকলের সাহায্য করিবার জন্য তৎপর হইয়া থাকা একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সকল সময় সকলের কার্য্যের সহায়তা করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হন, এবং তাহা হইলেই সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হয়।

রাজার যেমন রাজ্যশাসন করিতে হইলে প্রজাপালন করিতে হয়,—ধনী হইতে দরিদ্র সকলেরই সুখের আয়োজন করিয়া দিতে হয়,—যেমন জগতের আদি নিয়ন্তা করুণাময় পরমেশ্বর অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে ধূলিকণা, পশুরাজ সিংহ হইতে কীটানুকীট সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সঙ্গিনীরও ঠিক সেইরূপ স্বামী হইতে দাস-দাসী,—প্রতিবেশী হইতে দরিদ্র ভিক্ষুক সকলেরই কথা চিন্তা করা উচিত। যে সঙ্গিনী ইহা করিতে অক্ষম,—অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করিয়া যে ইহা করে না সে প্রকৃত সঙ্গিনী নামের একেবারেই যোগ্য নহে;—তাহার দ্বারা সংসারে কেবল অশান্তিরই বৃদ্ধি হয়। সে কেবল সংসারে দুঃখের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।

যে পরের সম্মুখে অহঙ্কার প্রকাশ করে না,—যে সকলের সম্মুখে নম্রতা ও মিষ্টতা প্রকাশ করে,—যে সকলের নিকট নীচু হইয়া চলে সে জগতে সকলেরই ভক্তির পাত্র হয়। সঙ্গিনীর এই তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে কি কি প্রয়োজন তাহা আমরা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখিলাম। সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য অসংখ্য, কাজেই

তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ কোন দিনই প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে পারে না। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে বাল্যকাল হইতে সেই ভাবে গঠিত হওয়া উচিত। আমরা সঙ্গিনীর ভূষণ ও কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছি, এইবার আমাদের দেশের কয়েকটি আদর্শ সঙ্গিনীর কথা যাহা প্রত্যেক সঙ্গিনীর জানা উচিত—তাহাই বলিয়া পুস্তক শেষ করিব।

আদর্শ সঙ্গিনী

সতী

সতীর পতিভক্তির দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বঙ্গ-ললনার আদর্শ হওয়া উচিত। সতীর জীবনে যেরূপ দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ পাইয়াছিল এমন আর জগতে একটিও দৃষ্টিগোচর হয় না। দক্ষ রাজার বড় আদরের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সতী,—আবাল্য রাজসুখে বৰ্দ্ধিত—রাজার কন্যা সতী,—রূপে স্বর্ণপ্রতিমা, গুণে সর্ব্বলোক মনোমোহিনী ছিলেন। তিনি ভিখারী শিবের গৃহিণী হইয়া ভিখারিণী হইয়াছিলেন। পতির চরণে নিজ প্রাণ অঞ্জলি দিয়া তিনি রাজসুখ ভুলিয়া পতির কুটির বাসেই রাজভোগ মনে করিতেন। হাড়মালা-বিভূষিত ভাঙ্গে বিঘূর্ণিত নয়ন, পতির সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। তাঁহার পতি-সেবার গুণে কৈলাশ সুখ-শান্তিতে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। যে সুখের বর্ণনা করিতে প্রধান প্রধান কবিগণও পরাস্ত হইয়াছেন।

সতীত্বের চরম আদর্শ দেখাইবার জন্যই বোধ হয় দক্ষরাজ কন্যা সতীর জন্ম হইয়াছিল। তাই দক্ষরাজ জামাতা ভিখারী শিবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দক্ষ-যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং তাহাতে ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন

না। দেবর্ষি নারদের মুখে এই সংবাদ কৈলাশে উপস্থিত হইলে, সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। শিব অনিচ্ছা সহকারে সতীকে পিত্রালয়ে যাইতে অনুমতি দিলেন। কেন তাঁহার ভিখারী পতিকে নিমন্ত্রণ করা হইল না,—তিনি তাঁহার চরণে কি অপরাধ করিয়াছেন, কেবল সেইটুকুই পিতার নিকট জানিবার জন্য সতী পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

সতী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভিখারিণী বেশ, তাঁহার কালিমারঞ্জিত বদন-কান্তি দেখিয়া দক্ষ ক্রোধে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিতেন, তাঁহার ভিখারিণী বেশ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। দক্ষরাজ একবারও ভাবিলেন না যে, সেই ভিখারিণী বেশের ভিতর সতীর হৃদয়ে কত আনন্দ, কত সুখ প্রবাহিত হইতেছিল। দক্ষ সতীকে সম্বোধন করিয়া যজ্ঞ-সভার মধ্যস্থলেই শিবকে যথেষ্ট ভৎর্সনা ও নিন্দা করিতে লাগিলেন। পতি-নিন্দা সতীর একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি পিতার চরণ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পতিনিন্দা করিতে বার বার নিষেধ করিলেন কিন্তু ক্রোধে অন্ধ জ্ঞানশূন্য দক্ষের কর্ণে সতীর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। পতি-নিন্দা সতীর অসহ্য হইয়া পড়িল, তিনি পিতার চরণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সেই মূর্চ্ছাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর হইতে চিরদিনের মত বাহির হইয়া গেল।

এই নিদারুণ শোক-সংবাদ যখন কৈলাশে উপস্থিত হইল

তখন পাগল শিব একেবারে উন্মত্ত হইয়া দক্ষালয়ে ছুটিলেন। রুদ্রতেজে দক্ষযজ্ঞ ছারখার হইয়া গেল। পাগল সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে, বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর দেহ অবশেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেন। কিন্তু শিব ও সতীর হৃদয় এমনই সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিল যে, সতী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও শিব ছাড়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে আবার জন্ম হইল। আবার তাঁহার শিবের সহিত বিবাহ হইল।

শিব-সতীর দাম্পত্য প্রেম পুরাণের শত পৃষ্ঠা জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহা শত কবি শত রং ফলাইয়া জগতের চক্ষের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পতি ও পত্নীর এরূপ প্রেম জগতে সত্যই বিরল। প্রত্যেক বঙ্গ-বালার সতীর আদর্শে গঠিত হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সতীত্বের মহিমা প্রচার করা উচিত।

সাবিত্রী

এমন বোধ হয় একজনও বঙ্গ-ললনা নাই, যিনি সাবিত্রীর নাম শুনেন নাই। সতীত্বের মাধুরী সাবিত্রীর জীবনে যেমন বিকশিত হইয়াছে, জগতে এমন আর কাহারও জীবনে হয় নাই। সতী সাবিত্রীর পিতা বহুকাল হইতে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা সাবিত্রীও তাঁহার সহিত অরণ্যে বাস করিতেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির বহুকাল পর্য্যন্ত কোন পুত্র কন্যা হয় নাই, শেষে অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়া দেবতার বরে তিনি এই দেববালার ন্যায় রূপবতী কন্যা লাভ করেন।

সাবিত্রী পিতার সহিত যে অরণ্যে বাস করিতেছিলেন তাহারই অপর প্রান্তে এক অন্ধ নরপতি তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পত্নী ও তাঁহার একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করিতেছিলেন। অন্ধ নরপতির পুত্রের নাম সত্যবান। সত্যবান প্রত্যহ পিতা-মাতার জন্য অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিতেন।

দৈব্যক্রমে এক দিবস তাঁহার সহিত সাবিত্রীর সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়। ক্রমে সেই প্রেম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রেমের এমনি নিয়ম যে, ক্রমেই উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা ক্রমে তাহাদের পিতামাতার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মহারাজ অশ্বপতি তাঁহার স্নেহের কন্যার সুখের জন্য প্রথম সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন এক ঋষি গণনার দ্বারা অশ্বপতিকে জানাইলেন যে, যে দিন সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইবে তাহার ঠিক এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে। এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া কোন্ পিতা এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন? কাজেই অশ্বপতি সত্যবানের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সাবিত্রী কাহার কথা শুনিলেন না, তিনি স্পষ্টই পিতাকে বলিলেন যে, সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ না হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ কথার উপরে আর আপত্তি চলে না, মহারাজ অশ্বপতিকে স্বীকৃত হইতে হইল। এক শুভদিনে এক শুভলগ্নে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ হইয়া গেল।

সাবিত্রী পতি ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় আনন্দে এক বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু তিনি ঋষি-বাক্য বিস্মৃত হন নাই। সত্যবান্ যে তাঁহাকে বিবাহ করিবার পর মাত্র এক বৎসরকাল বাঁচিবেন

সে কথা তিনি এক মুহূর্ত্তের তরেও ভুলেন নাই। তিনি এক এক দিন করিয়া বৎসরের দিনগুলি গুণিয়া আসিতেছিলেন। যে দিন ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হইল সেইদিন প্রাতে সত্যবানকে কুঠার লইয়া বহির্গত হইতে দেখিয়া তিনি সত্যবানের শত নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত কাষ্ঠ আহরণে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশ নিরাপদেই কাটিয়া গেল। ঋষি-বাক্য বুঝি বা মিথ্যা হয়। সাবিত্রী মহানন্দে পতির সহিত গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় সহসা সত্যবান সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে সহসা আমার বড় শির-বেদনা আরম্ভ হইয়াছে। এস এই স্থানে একটু বিশ্রাম করি।"

সত্যবান এই কথা বলিতে বলিতেই সেই স্থানে শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সাবিত্রীর সমস্ত প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া তাঁহার শিহরে উপবেশন করিলেন। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইবার নয়; দিবসের শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবানেরও প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী অচল অটল,—তিনি পাষাণের ন্যায় মৃত স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর উপর ঢলিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অরণ্য অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল। যমদূতগণ সত্যবানের দেহ লইবার জন্য সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সত্য-

বানের মস্তক সতীর কোলে স্থাপিত,—যমদূতের সাধ্য কি যে, সে সতীদেহ স্পর্শ করে। কাজেই তাহারা ফিরিয়া গেল এবং সমস্ত সমাচার যমরাজকে প্রদান করিল। দূতের মুখে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু তিনিও সতী-দেহ স্পর্শ করিতে পারিলেন না।

যমরাজ সাবিত্রীকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, শেষ তাঁহার অন্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্ষু প্রদান করিতে স্বীকৃত হওয়ায় সতী পতির দেহ ছাড়িয়া দিলেন,—কিন্তু যমরাজকে ছাড়িলেন না, তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া সাবিত্রীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া যমরাজ সাবিত্রীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, ও তাঁহার শ্বশুর তাঁহার স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন এই বর প্রদান করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তবুও তাঁহার সঙ্গ না ছাড়ায় যমরাজ অস্থির হইয়া উঠিলেন,—তিনি সাবিত্রীকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া পুনরায় বর দিতে স্বীকৃত হইলেন। সাবিত্রী তাঁহার নিকট হইতে এই বর চাহিলেন যে, সত্যবান হইতে তাঁহার যেন শত পুত্র জন্মে। যমরাজ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভাল মন্দ না বিবেচনা করিয়াই তথাস্তু বলিলেন। যমরাজ বর প্রদান করিয়াই অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন কিন্তু সাবিত্রী করযোড়ে বলিলেন, "দেব আপনি যদি আমার পতিকে লইয়া যান তবে কেমন করিয়া আমার সত্যবান হইতে শত পুত্র হইবে?"

সাবিত্রীর কথায় তখন যমরাজের জ্ঞানোদয় হইল। দেবতার বর মিথ্যা হইবার নয়। সত্যবান আবার প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে শত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

সতীত্বের বলে সাবিত্রী মৃত-পতিকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সতীত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত সত্যই জগতে বিরল। পতির কল্যাণের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক বঙ্গ-বালাই সাবিত্রীর ব্রত করিয়া থাকেন। সকলেরই কি সাবিত্রীর মত হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়? প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে সাবিত্রীকে জীবনের আদর্শ করা উচিত।

দময়ন্তী
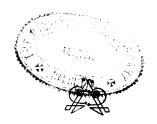
সতী শিরোমণি দময়ন্তীর ইতিহাস পুরাণের শত পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রখিয়াছে। দময়ন্তীর সহিত মহারাজ নলের বিবাহ হয়। প্রবাদ আছে, দেবতাগণ দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার জন্য দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। দেবতাগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সতী দময়ন্তী পূর্ব্বেই নলরাজকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। অমরাবতী লাভের প্রলোভনেও সতী যে অপর কাহার গলে মালা প্রদান করিবেন না তাহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না;—তাই তাঁহারা দময়ন্তীকে ছলনায় ভুলাইবার জন্য সকলেই নলের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সতী স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া একস্থানে নলবেশী পঞ্চজনকে উপবিষ্ট দেখিয়া তখনই বুঝিলেন দেবতারা তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। সতী কেবল সতীত্বের মহিমায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন,—দেবতাগণের ছলনা ধরা পড়িল। তাঁহারা নিজ নিজ বেশ ধারণ করিয়া,—দময়ন্তীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বয়ম্বর সভা পরিত্যাগ করিলেন।

সতীত্বের আদর্শ দেখাইতেই সতী রমণীরা জগতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণেই বোধ হয় পুণ্যবান্ নলরাজের সহিত

কলির বিবাদ উপস্থিত হয়। কলির গ্রহচক্রে পড়িয়া নলরাজ রাজ্য হারাইলেন। নলরাজ রাজ্য হারাইয়া পত্নীর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন,—দময়ন্তী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল,—এক্ষণে দময়ন্তীর কি হইবে সেই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু সাধ্বী সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। পতি-সঙ্গই তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ ছিল,—রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ সমস্তই যে তাঁহার পতি। তিনি সানন্দ চিত্তে, সহাস্য মুখে এক বস্ত্রে পতির সহিত বনগমন করিলেন এবং দিন রাত্রি পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার বনবাস ক্লেশ ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইখানেই সতীর পরীক্ষার শেষ নয়। কলির ছলনায় ভুলিয়া নলরাজ সেই গভীর বনে সতী সাধ্বী পত্নীকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহাতেও সতী একবারের জন্যও পতির উপর দোষারোপ করিলেন না;—তিনি পাগলিনী হইয়া পতির অন্বেষণে বনে বনে ছুটিতে লাগিলেন। অরণ্যে একাকিনী রমণীর পদে পদে বিপদ,—কিন্তু সতীত্বের এমনি মহিমা যে শত বিপদেও তিনি কাতর হইলেন না। তিনি সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া একমাত্র পতির মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নলরাজের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সতীত্ব-ভূষণে ভূষিত নারীর কোন দিনই বিপদ থাকিতে পারে না। আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে

সমস্ত বিপদ হইতে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। যে রমণীর দিবানিশি পতি চিন্তায় সমস্ত প্রাণ পতিময় হইয়া যায় তাহার কি কখনও দুঃখ থাকিতে পারে? দময়ন্তী স্বামী অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষ তাঁহার মাতুলালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নলের সহিত আবার তাঁহার মিলন হইল। সতীত্বের মহিমায় শেষ কলিও পরাজিত হইল। মহারাজ নল আবার সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইলেন। তিনি স্বরাজ্যে ফিরিয়া পত্নী সতী সাধ্বী দময়ন্তীকে লইয়া মহাসুখে প্রজাপালন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন।

শৈব্যা

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হরিশ্চন্দ্রের পত্নী সাধ্বী শৈব্যার কথা আজও পুরাণের শত পৃষ্ঠে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তিনি রাজ-রাণী হইয়াও পতির জন্য সমস্ত দুঃখই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কলহ উপস্থিত হয়। হরিশ্চন্দ্র সমস্ত রাজ্য বিশ্বামিত্রকে দান করেন কিন্তু তাহাতেও মহর্ষির ক্রোধের উপশম হয় না। হরিশ্চন্দ্র ঋষির নিকট ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ভিক্ষুকবেশে ভিক্ষা করিয়াও তিনি ঋষির ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ভিক্ষুকবেশে তিনি যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন তখন সতী সাধ্বী শৈব্যা তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে ছিলেন ;—এক মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন কোন প্রকারেই ঋষির ঋণমুক্ত হইল না তখন তিনি তাঁহার পতিকে তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ঋষির ঋণমুক্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সাধ্বী পত্নীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করেন। ইহাতেও তাঁহার দুঃখের অবসান হয় নাই, শেষ তাঁহাকে গঙ্গাপুত্ররূপে শ্মশানে বাস করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের নিকট হইতে পয়সা পর্য্যন্ত আদায় করিতে হইয়াছিল।

এদিকে শৈব্যা ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিয়া তাঁহার বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু যখন ভাগ্য মন্দ হয় তখন চারিদিক হইতেই অমঙ্গল আসিতে থাকে। সহসা একদিন তাঁহার পুত্রকে সর্পে দংশন করে। সর্প-দংশনে অচিরে পুত্রের মৃত্যু হয়। শৈব্যা পুত্রশোকে একেবারে পাগলিনী হইয়া উঠেন ও মৃত পুত্রের যাহাতে সৎকার হয় তাহার জন্য প্রত্যেককে বিশেষ মিনতি করিয়া বলেন। কিন্তু পরিচারিকার পুত্রের কে সংকার করিবে? শৈব্যার শত মিনতি সত্ত্বেও কেহই তাঁহার পুত্রের সংকার করিতে স্বীকৃত হয় না। কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া প্রাণের শোক প্রাণে চাপিয়া শৈব্যা তাহার মৃত পুত্র কোলে করিয়া একাকিনী সেই রাত্রে পুত্রের সৎকারের জন্য শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হন। সে শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র গঙ্গা-পুত্ররূপে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্ধকারে উভয়ে উভয়কে চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই। শেষ একটুখানি বিদ্যুতের আলোয় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারেন। তখন উভয়ে মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া কাঁদিয়া শ্মশান ভাসাইয়া দেন।

এ দৃশ্যে কঠিন হৃদয় বিশ্বামিত্র ঋষিরও প্রাণ বিগলিত হইয়া পড়ে। তিনি শৈব্যার সতীত্ব ও পতিভক্তি দেখিবার জন্য সেই শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হন ও অবিলম্বে শৈব্যার মৃত পুত্রকে প্রাণদান দেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে আবার সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করিয়া দেন।

সতীত্বের মহিমা প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা জগতে আসিয়া-

ছিলেন,—যাঁহারা আদর্শ সঙ্গিনীরূপে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক শেষ করিলাম। বঙ্গদেশে সতী রমণীর আদর্শের অভাব নাই। সীতা ও বেহুলাও সতীত্বের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এ পুস্তকে সকলের কথা বলা সম্ভব নয়। এই সকল পুণ্যময়ী রমণীদিগের বিষয় না জানিলে,—ইঁহাদের আদর্শে না গঠিত হইয়া উঠিলে, কেহই প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে পারে না। বঙ্গ-ললনার ইঁহাদের বিষয় বিশেষ ভাবে জানিয়া রাখা উচিত ;—এবং সতীত্বের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি চিরদিনের মত ধরার পৃষ্ঠে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক সঙ্গিনীর একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।